S@ifur's BCS

৩৬তম লিখিত

রোগ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা

- ☑ পরজীবী, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া
- ☑ রক্ত, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, উচ্চরক্তচাপ, Heart Attack, Stroke
- ☑ HIV/ AIDS
- ☑ ক্যান্সার ও ক্যান্সার-চিকিৎসা
- ☑ রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা
- ☑ হরমোন ও এনজাইম
- ☑ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
- ☑ Biotechnology
- ☑ Food & Nutrition

০৯ ১০

মোঃ মাহফুজুর রহমান
SMS : 01613 43 20 65

সা. বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

BCS নিয়ে যে কোন পরামর্শ ও
অভিনন্দন দিয়ে Comment/Like করুন-
www.facebook.com/groups/saifurs.bcs.achievement

Scanned by CamScanner

BCS Syllabus on Disease and Healthcare

Disease and Healthcare : Deficiency, Infection, Antiseptic, Antibiotics, Stroke, Heart Attack, Blood Pressure, Hypertension and Diabetes, Dengue; Diarrhoea; Drug addiction, Vaccination, Cataract, food poisoning, X-ray; Ultrasonography; CT Scan; MRI; ECG; Endoscopy; Radiotherapy; Chemotherapy; Angiography; uses, risk and side-effects of above techniques; Basic concept of Cancer, AIDS and Hepatitis.

Biotechnology : Chromosome; shape, structure and chemical composition of chromosome; nucleic acid; deoxyribonucleic acid (DNA); ribonucleic acid (RNA); protein; gene; DNA test; forensic test; genetic disorder in human beings; Biotechnology and Genetic Engineering; cloning; social effects of cloning; transgenic plants and animals; Use of biotechnology in agricultural, milk products and pharmaceutics; Gene therapy; Genetically modified organism; Nanotechnology; Pharmacology; Pharmacokinetics.

Food and Nutrition : Elements of food; carbohydrates; protein; fats and lipid; vitamins; types and sources of carbohydrates, proteins; nutritional value; menu of balanced diet; the pyramid of balanced diet; body mass index (BMI); fast food or junk food; preservation of food; various processes of storing food; use of chemicals for preservation of foods and its physiological effects.

বিগত সালের প্রশ্নবলী

☒ খেজুরের রসের মাধ্যমে সংক্রমণযোগ্য ভাইরাসের নাম লিখুন। (৩৫তম BCS)

☒ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতি সম্প্রতি ও নিকট অতীতে ছড়িয়ে পড়া তিনটি ভাইরাসজনিত রোগের নাম লিখুন। (৩৫তম BCS)

☒ নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : (৩৫তম BCS)

মিনহাজ দধি তৈরির জন্য সন্ধ্যার সময় ফুটন্ত দুধে বাসি দধির সামান্য অংশ starter cul-ture হিসাবে মিশ্রিত করলো। কিছু সময় পর দুধ ঠান্ডা হলে সারারাত ৩৭-৪০° C তাপমাত্রায় Incubate করলো। পরদিন সকালে মিনহাজ লক্ষ্য করলো দুধ জমাট বাঁধেনি এবং কাঙ্ক্ষিত দধি তৈরি হয়নি।

ক. জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত তিনটি দুগ্ধজাত খাদ্যের নাম লিখুন।

খ. উদ্দীপককে উল্লেখিত starter culture কী? এতে কী থাকে?

গ. দুধ দধিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. মিনহাজের দধি তৈরিতে ব্যর্থতার কারণ কী?

☒ মানুষের দেহকোষে কয়টি ক্রোমোজোম থাকে? এদের মধ্যে কয়টি সেক্স ক্রোমোজোম? (৩৫তম BCS)

☒ জিন (gene) বলতে কী বোঝায়? জেনেটিক বিশৃঙ্খলার দুটি কারণ লিখুন। (৩৫তম BCS)

☒ DNA টেস্টের মাধ্যমে বিবাদমান দম্পতির পিতৃপরিচয় কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? (৩৫তম BCS)

☒ কৃষিবিজ্ঞানে GMO- এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। (৩৫তম BCS)

☒ নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : (৩৫তম BCS)

শতায়ু করিম সাহেব– এর নিয়মিত প্রাতঃভ্রমনের সঙ্গী হওয়ার জন্য তাঁর কোনো বন্ধু-বান্ধবই আজ আর বেঁচে নেই। তিনি স্বল্পাহারী মানুষ। সারাজীবনই তেল-চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করেছেন। টাটকা ফলমূল, সালাদ ও শাক-সবজী তাঁর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অংশ ছিল। কৈশোর ও যৌবনে নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করেছেন। তিনি সৎ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। সবসময় মানুষের মঙ্গল চিন্তা করেছেন এবং ধর্মপরায়ণ মানুষ হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

ক. ভিটামিন, এন্টি-অক্সিডেন্ট ও ফ্রি-রেডিক্যাল কী?

খ. মানবদেহে ফ্রি-রেডিক্যালের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

গ. স্বাস্থ্য রক্ষায় ভিটামিন ও এন্টি-অক্সিডেন্টের ভূমিকা কী?

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত করিম সাহেবের জীবনাচরণ তাঁকে দীর্ঘায়ু প্রাপ্তিতে কীভাবে সাহায্য করেছে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করুন।

- ☒ খাদ্য দূষণ (Food poisoning) কী? সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দূষণের উদাহরণ দিন। (৩৫তম BCS)
- ☒ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার এর লক্ষণসমূহ কি কি? এর চিকিৎসা উল্লেখ করুন। (৩৪তম BCS)
- ☒ এল.ডি.এল ও এইচ.ডি.এল কি? মানবদেহে এদের কাজ কি? (৩৪তম BCS)
- ☒ রক্তের Rh ফ্যাক্টর কি? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? (৩৪তম BCS)
- ☒ মানুষের রক্তের গ্রুপগুলো কি কি? রক্তের R_h বা রেসাস ফেক্টর কি? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? (৩৩, ২৫, ২৪ ও ১৫তম BCS)
- ☒ হিমোগ্লোবিন কি? এটি মানব দেহে কোন ভূমিকা পালন করে? (৩৩, ২১তম BCS)
- ☒ রক্তচাপ কি? Systolic ও Diastolic Pressure বলতে কি বুঝায়? রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম লিখুন। (৩৩, ২৫ ও ১১তম BCS)
- ☒ কেমিওথেরাপি কি? ইহা কেন ব্যবহার করা হয়? (৩৩, ১০তম BCS)
- ☒ ইনসুলিন (Insulin) কি এবং এটি কি কাজে লাগে? (৩৩, ২১ ও ১৫তম BCS)
- ☒ ডায়াবেটিক ও ইনসুলিন-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। (৩৩তম BCS)
- ☒ প্রোটিন কি? এর তিনটি গুরুত্ব লিখুন। (৩৩তম BCS)
- ☒ Vaccine কি? ভ্যাক্সিন (Vaccine)-এর প্রয়োগ লিখুন। (৩৩তম BCS)
- ☒ মানবদেহে কিডনীর কাজ কি? (৩৩তম BCS)
- ☒ অতি পরিচিত পাঁচটি পানিবাহিত রোগের নাম লিখুন? (৩৩তম BCS)
- ☒ Angins বলতে কি বুঝায়? Heart Attack ও Stroke এর মধ্যে পার্থক্য কি? Coronary Angiography কি? হৃদরোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'Coronary by-pass' ও 'angioplasty'-এর মধ্যে পার্থক্য কি? Pacemaker কি? (৩১, ৩০, ২৮, ২৩, ২১তম BCS)
- ☒ হরমোন কি? মানবদেহে হরমোনের কাজ লিখুন। (৩১ ও ২৫তম BCS)
- ☒ ভিটামিন 'এ', 'ডি' ও 'কে' এর কাজ কি? ভিটামিন 'এ', 'ডি' ও 'কে' এর অভাবে কি ঘটে? (৩১, ২৯ ও ২৫তম BCS)
- ☒ ব্লাড ক্যান্সার কত প্রকার? এর চিকিৎসা সম্পর্কে লিখুন। (৩১তম BCS)
- ☒ উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) কি? উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ,কারণ ও প্রভাবগুলো বর্ণনা করুন। (৩০তম BCS)
- ☒ Anthrax কি? এ রোগের উৎস, বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (৩০তম বিসিএস)
- ☒ হেপাটাইটিস কি? এটি কি কারণে হয়? এর জন্য দায়ী জীবাণু কত রকমের হয়? কোন জীবাণুগুলো রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়? (৩০ ও ২৭তম BCS)
- ☒ Antibiotic ও Antiseptic কি? উদাহরণ দিন। (৩০, ২৮তম BCS)
- ☒ Vaccination বলিতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে মানবদেহের জন্য প্রচলিত Vaccine গুলি কি কি ? (৩০তম BCS)
- ☒ প্যারাসাইট ও ভাইরাস বলতে কি বুঝায়? এরা কিভাবে দেহকে রুগ্ন করে? (২৯তম BCS)
- ☒ কোলেস্টেরল কি? এলডিএল ও এইচডিএল কি? কোলেস্টেরল মানব দেহে কি ক্ষতি করে? কিভাবে কোলেস্টরল কমানো যায়? (২৯, ২৭, ২৪, ১৩ ও ১০তম BCS)
- ☒ HIV কি? AIDS কি? HIV/AIDS কিভাবে ছড়ায়? এর রোগের আক্রমণের লক্ষণ ও প্রভাব আলোচনা করুন। কিভাবে HIV/AIDS প্রতিরোধ করা সম্ভব? (২৯, ২৭, ২৪, ২৩, ১৫ ও ১০তম BCS)
- ☒ রোগ নিরূপণে EEG, ECG এবং CT Scan- এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন। (২৯ ও ২০তম BCS)
- ☒ Antigen, Antibody ও Immunity কি? (২৮তম BCS)
- ☒ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান কি? এটির জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগের নাম লিখুন। (২৭তম BCS)
- ☒ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান কি? এটির জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগের নাম লিখুন। (২৭তম BCS)
- ☒ কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য কাকে বলে? এরা কিভাবে রোগ তৈরি করে? (২৭তম BCS)

Scanned by CamScanner

- ☒ খাবার স্যালাইনে ব্যবহৃত চিনি/ গুড়া ও লবণের প্রয়োজন কি? (২৭তম BCS)
- ☒ ভ্যাক্সিন কি? গুটি বসন্তের টিকা কিভাবে তৈরি হয়? (২৭তম BCS)
- ☒ ডিজইনফেক্ট্যান্ট এবং এ্যান্টিসেপটিক-এর মধ্যে প্রভেদ কি এবং এদের প্রয়োগস্থান কোথায়? (২৭তম BCS)
- ☒ ডেঙ্গু রোগে রক্তের কোন কণিকা ভেঙে যায়? এই রোগ কিভাবে বাহিত হয়? (২৫ তম BCS)
- ☒ ডায়রিয়ায় ডাবের পানি উত্তম কেন? (২৫ তম BCS)
- ☒ পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত এনজাইমগুলো কি কি? (২৪ তম BCS)
- ☒ ক্রোমোজোম (Chromosime) ও জিন (Gene)-এর পার্থক্য কি? (২৪ ও ১৫তম BCS)
- ☒ পেটে গ্যাস হলে কার্বন ট্যাবলেট সেবন করতে বলা হয় কেন? (২৩তম BCS)
- ☒ মানবদেহে কিডনীর কাজ কি? (২৩তম BCS)
- ☒ মানবদেহে শিরার মধ্যে বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করানো বিপজ্জনক কেন? (২৩তম BCS)
- ☒ 'Test-tube' শিশু কি? (২৩তম BCS)
- ☒ জলাতঙ্ক কি? এর কারণ ও প্রতিকারের উপায় উল্লেখ করুন। (২২তম BCS)
- ☒ ক্রোমোজোম কি? ক্রোমোজোম কোষের কোথায় অবস্থান করে? (২২তম BCS)
- ☒ পাকস্থলীতে যে এসিড হয় এটি কি? (২১তম BCS)
- ☒ ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) এবং ভাইরাস (Virus) এর মধ্যে পার্থক্য কি? (২০তম BCS)
- ☒ পাতলা পায়খানা হলে স্যালাইন খাওয়ানো হয় কেন? (২০তম BCS)
- ☒ 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'- এর একটি প্রয়োগ বর্ণনা করুন। (২০তম BCS)
- ☒ পরিপাকযন্ত্রের মধ্যে হজমে সাহায্যকারী উপাদান কি কি? (১৮তম BCS)
- ☒ পাইয়োরিয়া ও ফাইলেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? (১৭তম BCS)
- ☒ ভাইরাস কি? ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্বসমূহ আলোচনা করুন। (১৭তম BCS)
- ☒ পেনিসিলিন কি এবং কে আবিষ্কার করেন? (১৫তম BCS)
- ☒ 'জিন ব্যাংক' বলতে কি বুঝায়? (১৩তম BCS)
- ☒ ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ নিবারণে সবুজ শাকসবজি কিছু তেল দিয়ে রান্না করে খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এখানে তেলের ভূমিকাটা কি? (১৩তম BCS)
- ☒ জীব বিবর্তনে মানুষ যে প্রজাতি তার নাম কি? এ নামের অর্থ কি? (১৩তম BCS)
- ☒ ক্যান্সার কোষের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ কোষের পার্থক্য মূলত কি? (১৩তম BCS)
- ☒ ডায়রিয়া হলে যে লবণ গুড়ের শরবত খাওয়ানো হয়, তাতে লবণ ও গুড়ের (অথবা চিনির) ভূমিকা কি? (১৩তম BCS)
- ☒ কি ত্রুটির জন্য বহুমূত্র রোগ হয়? (১১তম BCS)
- ☒ বাতজ্বরের লক্ষণ কি? (১১তম BCS)
- ☒ শিশুদের কখন কোন টিকা দেয়া দরকার? ক) বি. সি. জি. (যক্ষ্মারোগ), খ) হাম, গ) পোলিও। (১১তম BCS)
- ☒ চোখের ছানি অপারেশনে কি করা হয়? (১১তম BCS)

S@ifur's BCS

Scanned by CamScanner

BCS প্রশ্নাবলী

পরজীবী, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া

☒ খেজুরের রসের মাধ্যমে সংক্রমণযোগ্য ভাইরাসের নাম লিখুন। **(৩৫তম BCS)**

খেজুর রসে সংক্রমণযোগ্য ভাইরাস হলো নিপাহ ভাইরাস। এর একমাত্র বাহক বাদুড়। বাদুড় থেকে খেজুর রসে এবং সেই রস মানুষ খেলে তা মানুসের দেহে সংক্রমিত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম ২০০১ সালে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে। খেজুর রসের পাতিলে বসে বাদুড় তাতে মুখ লাগিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে খেজুর রসের সাথে বাদুড়ের মুখের লালা মিশে যায়, পাত্রে বাদুড়ের বিষ্ঠা ও মুত্র সংমিশ্রণের সম্ভাবনাও থাকে। এ লালা ও মুত্র মিশ্রিত রস পান করে মানুষ প্রাণঘাতি নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। আবার বাদুড়ের খাওয়া, মুখ লাগানো বা ঠোকরানো ফলের মাধ্যমে নিপাহ ভাইরাস সংক্রমিত হয়। নিপাহ ভাইরাস প্রতিরোধে প্রথম করণীয় হলো কোন অবস্থাতে কাঁচা খেজুরের রস খাওয়া যাবে না। ৭০° সে. তাপমাত্রায় রস সিদ্ধ করলে নিপাহ ভাইরাস ধ্বংস হয়ে যায়। তাই খেজুরের রস সিদ্ধ করতে হবে। ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ার নিপাহ গ্রামে প্রথম এই প্রাণঘাতি ভাইরাস দেখা দেয়। তখন বাদুড়ের খাওয়া ফল শুকর খাওয়ার পর শুকর থেকে মানুষের দেহে এ ভাইরাস সংক্রমিত হয়। ঐ গ্রামের নামানুসারে ভাইরাসটির নামকরণ হয় নিপাহ ভাইরাস।

☒ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতি সম্প্রতি ও নিকট অতীতে ছড়িয়ে পড়া তিনটি ভাইরাসজনিত রোগের নাম লিখুন। **(৩৫তম BCS)**

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতি সম্প্রতি ও নিকট অতীতে ছড়িয়ে পড়া তিনটি ভাইরাস হলো নিপাহ ভাইরাস, ইবোলা ভাইরাস ও সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস।

☒ প্যারাসাইট বা পরজীবী ও ভাইরাস বলতে কি বোঝায়? এরা কিভাবে দেহকে রুগ্ন করে? **(২৯তম BCS)**

প্যারাসাইট বা পরজীবী ঃ যেসব জীব সারাজীবন বা জীবনের কোন একপর্যায়ে বা একাধিক পর্যায়ে জীবনধারণের জন্য ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীবদেহে বসবাস করে, এবং পরিনামে পোষকের ক্ষতি করে, তাদের প্যারাসাইট বা পরজীবী বলে।
যেমন ঃ গোলক্রিমি মানুষের দেহের অন্তঃপরজীবী, উঁকুন বহিঃপরজীবী হিসাবে মানুষের দেহে বসবাস করে।

ভাইরাস ঃ ভাইরাস হলো নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত এক প্রকার অতি আনুবীক্ষণিক অকোষীয়, রোগ সৃষ্টিকারী, সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম একপ্রকার জীবাণু যা সুনির্দিষ্ট পোষক কোষে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কেবল সেখানেই বংশবৃদ্ধি করতে পারে আবার জীবকোষের বাইরে জড় পদার্থের ন্যায় আচারণ করে।
উদাহরণ ঃ ইনফ্লুয়েজা ভাইরাস, টোবাকো মোজাইক ভাইরাস T_2 ব্যাকটেরিএফায ইত্যাদি।

দেহকে রুগ্ন করার প্রক্রিয়াঃ পোষকদেহ সব সময় পরজীবী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, প্যারাসাইট বা পরজীবী অনেক সময় পোষক দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে এবং বিষাক্ত দ্রব্য নিঃসৃত করে পোষকের মৃত্যু ঘটায়।

কোন জীব বা প্রাণীদেহের কোষে ভাইরাস সংক্রমনের পর এর নিউক্লিক এসিড কোষের মধ্যে প্রবিষ্ঠ হয়, কোষের মধ্যে নিউক্লিক এসিড প্রবেশ করার পর এটি কোষের জেনিটিক উপাদানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় নিউক্লিক এসিড তৈরি করতে থাকে। এভাবে পরবর্তীকালে ভাইরাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো তৈরি হয় এবং তা একসঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে পোষক কোষকে বিনষ্ঠ করে নতুন নতুন ভাইরাস বিমুক্ত হয়। ফলশ্রুতিতে পোষকদেহ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

☒ ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) এবং ভাইরাস (Virus) এর মধ্যে পার্থক্য কি? **(২০তম BCS)**

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) এবং ভাইরাস (Virus)- এর মধ্যে পার্থক্য

ব্যাকটেরিয়া	ভাইরাস
ক. কোষীয়।	ক. অকোষীয়।
খ. আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস আছে।	খ. নিউক্লিয়াস নেই।
গ. ব্যাকটেরিয়ায় DNA ও RNA উভয়ই পাওয়া যায়।	গ. ভাইরাস কখনও DNA ও RNA একত্রে থাকে না ।
ঘ. সাইটোপ্লাজম আছে।	ঘ. সাইটোপ্লাজম নেই ।

Scanned by CamScanner

☒ ভাইরাস কি? ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্বসমূহ আলোচনা করুন। **(১৭তম BCS)**

ভাইরাস হচ্ছে সূক্ষ্মদেহী অতি আণুবীক্ষণিক জীব। ভাইরাস অকোষীয়, কেবলমাত্র নিউক্লিয়িক এসিড ও প্রোটিন আবরণ দ্বারা গঠিত। এরা জীব দেহের ভিতরে কিংবা বাইরে অবস্থান করতে পারে। আবার ভাইরাস জীবিত অথবা মৃত উভয় দেহেই বাস করতে পারে। ভাইরাস গাছপালা, জীবজন্তু সবার মধ্যেই রোগ ছড়ায়। বসন্ত, পোলিও, হাম ইত্যাদি অনেক রোগ ভাইরাস ছড়ায়।

বৈশিষ্ট্য ঃ ক) ভাইরাস জীব দেহের ভেতর কিংবা বাইরে বসবাস করতে পারে।
খ) ভাইরাস জীবিত ও মৃত উভয় দেহেই বাস করতে পারে।
গ) ভাইরাস কেবলমাত্র (উপযুক্ত) পোষক কোষে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
ঘ) ভাইরাস প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক এসিড সমন্বয়ে গঠিত।

ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ
ক) ভাইরাস থেকে হাম, পোলিও এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরী করা হয়।
খ) ভাইরাস জেনেটিক কৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
গ) ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করার কাজে যেসব ভাইরাস কাজ করে তাদের ব্যাকটেরিও ফায বলে।

Student Work — পরজীবী, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া

☒ ভাইরাসের উপকারিতা এবং অপকারিতা লিখুন?

উপকারিতা ঃ
ক) বসন্ত, প্লেগ, পোলিও, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুতিতে ভাইরাস ব্যবহৃত হয়।
খ) ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ব্যকটেরিয়াঘটিত আমাশয়ের হাত থেকে মানুষকে বাঁচায়।
গ) মাটিতে ভাইরাস অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া প্রোটজোয়া ইত্যাদির মৃত্যু ঘটিয়ে তাদের দেহকে মাটিতে সার হিসাবে রূপান্তর করে।
ঘ) জিনতত্ত্বের গবেষণা বস্তু হিসাবে ভাইরাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অপকারিতা ঃ
ক) মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগ বিভিন্ন ভাইরাসের মাধ্যমে হয়।
খ) গরু ও মহিষের পা ও মুখের ক্ষতরোগ এবং কুকুর বিড়ালের "জলতাঙ্ক" ভাইরাসের মাধ্যমে হয়।
গ) উদ্ভিদের মোজাইক, লিফরোল প্রভৃতি রোগের কারণ ভাইরাস।
ঘ) মানুষের উপকারী প্রচুর সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে থাকে।

☒ ভাইরাসজনিত রোগগুলো কি কি?

ভাইরাসজনিত রোগ ঃ
১) **মানুষের রোগ ঃ** ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, হার্পিস, হাম, বসন্ত, এইডস, প্রভৃতি।
২) **গৃহপালিত পশুর রোগ ঃ** গরু ও মহিষের পা ও মুখের ক্ষত রোগ এবং কুকুর ও বিড়ালের জলতাঙ্ক, মুরগীর রানীক্ষেত ও বসন্ত রোগ প্রভৃতি।
৩) **উদ্ভিদের রোগ ঃ** উদ্ভিদের মোজাইক, ও লিফরোল প্রভৃতি।

☒ ব্যাকটেরিয়া কি? ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগগুলো কি কি?

ব্যাকটেরিয়া ঃ ব্যাকটেরিয়া এককোষী আনুবীক্ষণিক জীব। জীবজগতে এরা সর্বাপেক্ষা সরল, ক্ষুদ্রতম এদের কোষপ্রাচীর লিপিড, পলিমার, প্রোটিন দ্বারা গঠিত, এরা আদিকোষ। এদের কোষ বিভাজন হয় অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে, এরা সাধারণত ক্ষতিকর জীব হিসাবে পরিচিত থাকলেও এরা মানুষ ও পরিবেশের অনেক উপকার সাধনও করে থাকে।

Scanned by CamScanner

ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগগুলো ঃ

i) **প্রাণিজ রোগ ঃ** যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, ডিপথেরিয়া, আমাশয়, ধনুসটংকার হুপিং কাশি, ইত্যাদি।

ii) **উদ্ভিদের রোগ ঃ** আলুর রিং রোগ, ধান ও শিমের লেট ব্লাইট রোগ, টমেটো, আলু, শশা ও কুমড়া জাতীয় গাছের উইল্ট রোগ, লেবু গাছের কর্কট রোগ ইত্যাদি।

iii) অনেক ব্যাকটেরিয়া পানির সঙ্গে মিশে পানি দূষণ ঘটায়।

☒ নিপাহ ভাইরাস কি? এটি কিভাবে ছড়ায়? রোগের লক্ষণ ও করণীয় আলোচনা করুন।

নিপাহ ভাইরাস ঃ এটা প্যারামিক্সোভিরিডি পরিবারের অর্ন্তগত একটি ভাইরাস। ১৯৯৮ সালের দিকে মালেশিয়ায় প্রথম নিপাহ ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। **বাহক ঃ** টেরোপডিডি (Tteropodidae) গোত্রের বাদুড়ই নিপাহ ভাইরাসের প্রধান বাহক। এ বাদুড়ের আরেক নাম লার্জ ফ্লাইং ফক্স তবে শুকরের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।

যেভাবে ভাইরাস ছাড়ায় ঃ টেরোপডিডি গোত্রের বাদুড়ের মুখের লালা, মূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটে। এর প্রাথমিক বাহক হিসেবে কাজ করে ঐ বাদুড়ের লালা ও মুত্র। খেজুরের কাঁচা রস, আংশিক খাওয়া ফলমূল ইত্যাদির মাধ্যমে এ ভাইরাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসটি কার্যকরী সংক্রমক হওয়ায় তা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

i) মানবদেহে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমন ঘটলে উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর। সর্দি, তীব্র মাথাব্যাথা, শাসকষ্ট ও বমিভাব হয়।

ii) চরম পর্যায়ে মস্তিষ্কে প্রদাহ হলে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে রোগী আবোল-তাবোল বকতে পারে।

iii) খিঁচুনি ও অজ্ঞান ও হতে পারে।

আক্রান্ত হলে করণীয় ঃ

i) আক্রান্ত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব দূরে থেকে সেবাশুশ্রষা করা যেতে হবে।

ii) রোগীয় ব্যবহৃত জিনিস পত্র ব্যবহার করা যাবে না।

iii) রোগীর সাথে একই বিছানায় ঘুমানো যাবে না।

iv) আক্রান্ত ব্যক্তির লালা ও হাঁচি-কাশি থেকে দূরে থাকতে হবে।

v) তাৎক্ষণিকভাবে রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে।

সতর্কতা ঃ সরাসরি নিপাহ ভাইরাসের নিরময়ের কোন ওষুধ বা প্রতিষেক ভ্যাকসিন এখনও আবিস্কার হয়নি। তবে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে নিম্নলিখিত সর্তকতা অবলম্বন করতে হয় ঃ

i) পাখি দ্বারা আধা বা আংশিক ফল খাওয়া ও খেজরের কাঁচা রস পান করবেন না এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করুন।

ii) যে কোন ধরনের ফলমূল পরিস্কার পানি দিয়ে ভালোমতো ধুয়ে খান।

iii) আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসার পর সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।

Scanned by CamScanner

BCS প্রশ্নাবলী | রক্ত, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, উচ্চরক্তচাপ, Heart Attack, Stroke

মানুষের রক্তের গ্রুপগুলো কি কি? রক্তের R_h বা রেসাস ফেক্টর কি? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? **(৩৪, ২৫, ২৪ ও ১৫তম BCS)**

রক্তের গ্রুপ : মানুষের রক্তের গ্রুপ চারটি। এগুলো হলো- A (এ), AB (এবি), B (বি), এবং O (ও)।

R_h ফ্যাক্টর : রেসাস প্রজাতির বানরের রক্তে একটি এন্টিজেন থাকে। এটাকে রেসাস এন্টিজেন R_h বা ফ্যাক্টর বলে। কোনো কোনো মানুষের রক্তের কণিকায় ÔRh এগ্লুটিনোজেন' নামক বিশেষ উপাদান থাকে। এ এন্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিবেচনা করেই মানুষের রক্তের গ্রুপ R_h পজেটিভ ও R_h নেগেটিভ এ দু শ্রেণীতে বিভক্ত।

R_h ফ্যাক্টরেরগুরুত্ব ঃ

১) R_h নেগেটিভ মানুষকে R_h পজিটিভ মানুষের রক্ত দান করলে এবং R_h নেগেটিভ কোন মহিলার সাথে R_h পজিটিভ পুরুষের বিয়ে হলে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে ।

২) রক্তের বিভিন্ন রোগ যেমন- Hydrops foetalis, Erythroblastosis foetalis ইত্যাদি রক্তের R_h ফ্যাক্টরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কোলেস্টেরল কি? এলডিএল ও এইচডিএল কি? কোলেস্টেরল মানব দেহে কি ক্ষতি করে? কিভাবে কোলেস্টরল কমানো যায়?
(৩৪, ২৯, ২৭, ২৪, ১৩ ও ১০তম BCS)

কোলেস্টেরল : কোলেস্টেরল এক জাতীয় স্টেরয়েড এলকোহল। এটি পানিতে অদ্রবণীয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয় বলে স্নেহ জাতীয় পদার্থের দলভুক্ত। আমরা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় যে খাবার খাই, তা আমাদের শরীরের ভেতর বিপাকের পর নানা বিক্রিয়ায় ভেঙে গিয়ে নতুন নতুন উপাদানে পরিণত হয়। এমনি একটি উপাদান হচ্ছে এসিটিক এসিড বা এসিটেট। কোলেস্টেরলের উৎপত্তি এই এসিটেট থেকে। কোলেস্টেরল আমাদের রক্তনালী ও কোষে অবস্থান করে, বিশেষ করে নার্ভাস টিস্যুতে এর পরিমাণ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এ কোলেস্টেরল যখন আমাদের রক্তনালীতে জমাট বাঁধতে শুরু করে তখনই দেখা দেয় হাইপারটেনশন ও হৃৎপিণ্ডের নানা অসুখ তথা হৃদরোগ।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কোলেস্টেরল আবিষ্কৃত হয়। রক্তের মধ্যে, বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যে এবং শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গে বিশেষভাবে মগজ, যকৃৎ এবং ধমনীতে ইহা পাওয়া যায়। চর্বি এবং কোলেস্টেরলের অতিরিক্ত অংশ আরটারিস (arteries) বা ধমনীর গাত্রে জমা হতে থাকে। ইহার ফলে আরটারিস শক্ত হয়ে যায় এবং রক্তের অবাধ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলস্বরূপ আরটারিসে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ কমে যায় এবং সেই সঙ্গে শরীরের জীবনদায়ক অংশগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহও কমে যায়।

কোলেস্টেরল এর প্রকারভেদ :

ক) **এলডিএল (LDL) ঃ** এলডিএল- এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Low Density Lipoprotein, যা প্রাণিজ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়। এটি রক্তনালীর প্রাচীরগাত্রে জমে রক্তনালী সংকুচিত করে এবং রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এটিকে খারাপ কোলেস্টেরলও বলা হয়।

খ) **এইচডিএল (HDL) ঃ** এইচডিএল- এর পূর্ণ অভিব্যক্তি High Density Lipoprotein, যা উদ্ভিজ্জ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়। রক্তের প্রায় ৩০% কোলেস্টেরল এতে সঞ্চিত থাকে। একে মানবদেহের ভালো কোলেস্টেরলও বলা হয়।

কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার : অধিক কোলেস্টেরলযুক্ত চারটি খাবার হলো- ডিমের কুসুম, মাখন, গরুর মগজ, খাসীর কলিজা।

মানবদেহে কোলেস্টেরলের প্রভাব : খাদ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল থাকলে তা করোনারী আর্টারী অর্থাৎ যে সব শিরা বা ধমনীগুলো হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে তাতে জমা হয়। ফলে করোনারী আর্টারী বন্ধ হয়ে বা অত্যন্ত সরু হয়ে যেতে পারে। ধমনী বা শিরাগুলো উঁচু-নিচু ও অমসৃণ হতে যেতে পারে। রক্তে অধিক পরিমাণ কোলেস্টেরল জমা হলে তা ধমনীর গাত্রে আঠার মত লেগে পুরু প্রলেপ তৈরি করে। এতে ধমনীর রক্তচলাচলপথ সরু হয়ে রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে। রক্ত অক্সিজেনসরবরাহ করে বলে রক্তবাহী ধমনীতে বাধা সৃষ্টি হলে হৃদপিণ্ডে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পৌঁছায় না। এর ফলে হৃদরোগের সূচনা হয়। এছাড়া হৃদপিণ্ডের কোন কোন মাংসপেশী মরে যেতে পারে, উচ্চ রক্তচাপের কারনে মানুষের হৃদপিন্ডের ভাল্ব নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বৃক্কের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং সর্বপরি, মস্তিষ্কের ধমনী ছিঁড়ে রক্তক্ষরণ হবার সম্ভাবনা থাকে।

দেহে কোলেস্টেরল কমানোর প্রধান দুটি উপায় : i) চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার করা এবং ii) নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস করা।

Scanned by CamScanner

☒ Angins বলতে কি বুঝায়? Heart Attack ও Stroke এর মধ্যে পার্থক্য কি? Coronary Angiography কি? হৃদরোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'Coronary by-pass' ও 'angioplasty'-এর মধ্যে পার্থক্য কি? Pacemaker কি? (৩১, ৩০, ২৮, ২৩, ২১তম BCS)

Angins ঃ হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে প্রয়োজনের তুলনায় রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ কমে গেলে যে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে Angina Pectoris (অ্যান্‌জিনা পেকটোরিস) বলে। এই Angina Pectoris রোগটিই সংক্ষেপে Angina (অ্যান্‌জিনা) বা Angins (অ্যান্‌জিনস) নামে পরিচিত। এ রোগে আক্রান্ত রোগীর করোনারী ধমনীগুলো (Coronary Arteries) ৫০ থেকে ৭০ শতাংশেরও বেশি পরিমাণে সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে ব্যায়াম ও অন্যান্য শারীরিক পরিশ্রমের সময় যখন হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তখন করোনারী ধমনী প্রয়োজনমতো অক্সিজেন সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে বুকে ভারী ও চাপবোধ অথবা ব্যাথা অনুভূত হয়।

হার্ট অ্যাটাক

হার্ট অ্যাটাক তখন হয় যখন হৃদপিণ্ডের নিজস্ব কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ তথা অক্সিজেন সরবরাহে অসাম্য দেখা দেয়। হার্ট অ্যাটাক (Myocardial infarction) হঠাৎ মৃত্যুর প্রধান কারণ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে যতজন রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয় তার অর্ধেক হাসপাতালে পৌছানোর আগেই মারা যায়। দশ ভাগ হাসাপাতালে পৌছানোর পর মারা যায়। দশ ভাগ মারা যায় পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে। আর দশ ভাগ দশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আমাদের দেশে মৃত্যুর হার আরো বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

লক্ষণ ঃ হার্ট অ্যাটাক সচরাচর হঠাৎ হয়। রোগী শুয়ে, বসে অথবা কাজ করতে করতে হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। সঙ্গে প্রচুর ঘাম, শ্বাসকষ্ট, বমিভাব অথবা বমি থাকতে পারে। ব্যাথা এত প্রচণ্ড হয় যে রোগী মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পরে। এবং তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তবে বিশ ভাগ ক্ষেত্রে ব্যথা ছাড়াও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

কারণ/ ঝুঁকি ঃ

- → বয়স (বেশি বয়স)।
- → পারিবারিক ইতিহাস (পরিবারের অন্য কারো থাকলে)।
- → ধূমপান।
- → ডায়াবেটিস।
- → অধিক ওজন।
- → জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি।
- → পুরুষরা অধিক ঝুঁকি আক্রান্ত।
- → রক্তে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি (কোলেষ্টেরল)।
- → হাইপারটেনশন।
- → কম শারীরিক শ্রম।
- → অধিক মদ্যপান।

প্রতিকার ঃ প্রতিকার বলতে উপরে উল্লিখিত ঝুঁকিগুলো কমিয়ে রাখা বুঝায়। তার মধ্যে প্রথম তিনটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বাকীগুলোর মধ্যে ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন, রক্তের চর্বির পরিমাণ, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা। নিয়মিত কিছুটা শারীরিক পরিশ্রম (যেমন ব্যায়াম) করা এবং ওজন কমিয়ে রাখা যেতে পারে।

স্ট্রোক

রক্ত প্রবাহ ব্যাহত হলে মস্তিস্কে যে অংশে রক্ত প্রবাহ ব্যাহত হয় সেই অংশ শরীরের যে অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে তা দুর্বল অথবা অক্ষম হয়ে যায়। রোগী হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। একে স্ট্রোক বলে।

কারণ ঃ ক. রক্তনালীর রক্ত সরবরাহ করার ক্ষমতা কমে গিয়ে। খ. রক্তনালী ছিঁড়ে গিয়ে।

স্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধির কারণ ঃ ১. হাইপারটেনশন; ২. ডায়াবেটিস; ৩. ধূমপান; ৪. রক্তে চর্বি বৃদ্ধি (কোলেষ্টেরল); ৫. মদ্যপান; ৬. পরিবারের অন্য কারো হলে; ৭. জন্ম নিয়ন্ত্রন বড়ি; ৮. আঘাত

স্ট্রোকের লক্ষণ- সাধারণত রোগী দৈনন্দিন কাজে কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। এই রোগে রোগীর শরীরের কোন এক দিক দূর্বল হয়ে যায়। রোগীর কথা বলায় জড়তা দেখা দিতে পারে।

স্ট্রোকের প্রতিকার- স্ট্রোকের প্রতিকার বলতে উপরে উল্লিখিত ঝুঁকিগুলোকে কমিয়ে রাখা বুঝায়। হাইপারটেনশন ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের রাখার পাশাপাশি ধূমপান বর্জন এবং খাদ্যাভাসে চর্বিজাতীয় খাবার কম রাখা ভাল।

Scanned by CamScanner

Coronary Angiography ঃ Coronary অর্থ ধমনী এবং Angiography অর্থ প্রদর্শনবিদ্যা। অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যার সাহায্যে ধমনীতন্ত্রের প্রদর্শনকে Coronary Angiography বলা হয়। সাধারণত হার্টএটাক বা স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের হৃৎপিণ্ড, মস্তিক প্রভৃতি অংশের ধমনীর অবস্থা জানতে চিকিৎসকগণ এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন

Coronary bypass ঃ মানবদেহে তিনটি বড় ধমনীসহ আরো কয়েকটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ধমনী দ্বারা হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। যদি কোনো কারণে দুটি বা তিনটি বৃহৎ ধমনী দ্বারাই রক্ত প্রবাহ আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায় তবে সাধারণত যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় তাকে Coronary-by-pass বলা হয়। সাধারণত ধমনীতে চর্বি জমে, রক্ত জমাট বেধে বা ধমনী গাত্র সংকুচিত হয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বা বাধাগ্রস্ত হয়। Coronary-by-pass পদ্ধতিতে শরীরের অন্য কোনো স্থান থেকে শিরা কেটে এনে ধমনীর রক্ত চলাচলের বাধা প্রাপ্ত স্থানের ওপর থেকে নিচে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়। এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি তবে এ পদ্ধতিটি বেশ জটিল।

Angioplasty ঃ তিনটি বড় ধমনীর মধ্যে যে কোনো একটি ধমনী দ্বারা রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে এর চিকিৎসায় Coronary by pass-এর পরিবর্তে অপর একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যার নাম Angioplasty। এ পদ্ধতিতে এক বিশেষ ধরনের যন্ত্রের দ্বারা সমস্যাযুক্ত ধমনীর সংকুচিত স্থান বিশেষ ধরনের বেলুন দ্বারা প্রসারিত করা হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ পদ্ধতিটি Coronary by pass অপেক্ষা সহজতর। তবে এক্ষেত্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তির রক্ত চলাচল পুনরায় বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

Pacemaker ঃ পেসমেকার একটা ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্র। প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ও দেড় ইঞ্চি চওড়া। আর মাত্র এক থেকে দুই মিলিমিটার পুরু। এতে একটা সূক্ষ্ম তার আছে, সেটা একটা ছোট রক্তনালীর মধ্য দিয়ে হার্টে চালিয়ে দেয়া হয়। একটা ছোট অপারেশন করে যন্ত্রটা বুকের চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই অপারেশনের মাত্র ৪/৫ দিন পর রোগী বাড়ি ফিরে যেতে পারে। পেসমেকারের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স মস্তিষ্ক আছে যা ওই সূক্ষ্ম তারের মধ্য দিয়ে খবর পায় হার্ট চলছে না থেমে গেছে। হার্টের স্পন্দন থামলেই পেসমেকার বুঝতে পারে হার্টে বিদ্যুৎ সরবরাহে নিশ্চয়ই বিঘ্ন ঘটেছে। তখনই পেসমেকারের ইলেকট্রনিক মস্তিক ঐ তারের মধ্যে দিয়েই প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে পাঠিয়ে দেয়। হার্ট আবার পাম্প করতে আরম্ভ করে। এ ঘটনাগুলো এতো নিমিষে ঘটে যায় যে, হার্ট বন্ধ হয়ে ব্লাক আউট ইত্যাদি সমস্যার সূত্রপাতের কোনো অবকাশ থাকে না।

☒ উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) কি? উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ,কারণ ও প্রভাবগুলো বর্ণনা করুন। (৩০তম BCS)

উচ্চ রক্তচাপ ঃ উচ্চ রক্তচাপ এক ধরনের রোগ। একজন স্বাভাবিক মানুষের রক্তচাপ ১২০/ ৮০ এর মধ্যে থাকে। এই রক্তের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি এবং দীর্ঘস্থায়ী হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে ধরা হয়। স্বাভাবিক বিশ্রামরত অবস্থায় একজন ব্যক্তির রক্তচাপ যদি স্থায়ীভাবে নিচে ৯০ মিলিমিটার এবং উপরে ১৪০ মিলিমিটার মার্কারী বা তদূর্ধ্বে থাকে তখন তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে।

লক্ষণ ঃ i. মাথা ব্যথা, সাথে সাথে কখনো ঘাড়ে ব্যথা।
ii. অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি, বুকে ব্যাথা, নিদ্রাহীনতা।
iii. বুক ধড়ফড় করে এবং ব্যথা হয়।
iv. সামান্য শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন প্রস্রাব এবং সামান্য কারণে বিরক্তিভাব।
v. হঠাৎ করে শরীর ঘাম দিয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়।

কারণ- অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ প্রাথমিক ভাবে শুরু হয়। অর্থাৎ এর কারণ অজানা। তবে নিম্নোক্ত কারণগুলো উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টিতে সহায়তা করে-

১. **জন্মগত-** উচ্চরক্তচাপযুক্ত পিতা মাতার সন্তানদের একই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাছাড়া যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করার সময় ওজন কম থাকে তাদের উচ্চ রক্তচাপে ভোগার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

২. **পরিবেশগত-**
ক) অতিরিক্ত শারীরিক ওজন;
খ) বেশিমাত্রায় মদ্যপান;
গ) খাদ্যে বেশি লবণ খাওয়ার অভ্যাস;
ঘ) কোন বড় অসুখ বা আঘাত যা শরীরের ও মনের চাপ বাড়ায় তা উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে।

৩. এছাড়া কতগুলি রোগ আছে যা থেকে উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। (Secondary Hypertension) যেমন কিছু কিডনির রোগ, কিছু হরমোন জনিত রোগ এবং কিছু ঔষধ।

Scanned by CamScanner

প্রতিকার- হাইপারটেনশন যদি প্রাথমিক হয় অর্থাৎ অন্য কোন রোগ বা ঔষধের কারণে না হয়, সেক্ষেত্রে আজীবন ঔষধ গ্রহণের বিকল্প নেই। কিন্তু যদি এর কারণ জানা যায় (যেমন কিডনির রোগ অথবা হরমোনের প্রভাব অথবা ঔষধ) তবে কারণের প্রতিকার করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। খাদ্যাভাসে লবণ ও চর্বি জাতীয় খাবার কম খেয়ে উচ্চরক্তচাপে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

☒ **মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান কি? এটির জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগের নাম লিখুন।** **(২৭তম BCS)**

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান (Myocardial Infarction) ঃ কোনো কারণে হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে যে রোগের সৃষ্টি হয়, তাকে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান বলে, যা হার্ট অ্যাটাক (Heart attack) নামে পরিচিত। হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে করোনারী ধমনী (Coronary artery)। অনেক সময় এই করোনারী ধমনীর ভিতরের দিকের দেয়ালে কোলেস্টেরল জমা হয়ে রক্ত চলাচলের পথে সরু হয়ে যায় এবং চলাচল বাধা গ্রস্থ হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং সৃষ্টি হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান।

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশানের জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগ হলো ঃ

i. উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)
ii. বহুমূত্র রোগ (Diabetes)

☒ **হিমোগ্লোবিন মানব দেহে কোন ভূমিকা পালন করে?** **(২১ তম BCS)**

হিমোগ্লোবিন ঃ লোহিত রক্ত কণিকার সাইটোপ্লাজমস্থ এক ধরনের লৌহঘটিত প্রোটিন জাতীয় রঞ্জক পদার্থ হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। লোহিত রক্ত কণিকার কঠিন পদার্থের প্রায় ৯৫ ভাগই হচ্ছে হিমোগ্লোবিন।

মানবদেহে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকাঃ মানবদেহে হিমোগ্লোবিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর প্রধান কাজ হচ্ছে ফুসফুস হতে কলায় অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যাওয়া ও রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন। হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়া করে যথাক্রমে অক্সি-হিমোগ্লোবিন ও কার্বামাইনো হিমোগ্লোবিন নামে দু'ধরনের অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ দুটো রক্তের সাহায্যে দেহের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। অক্সি-হিমোগ্লোবিনসমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিন্ড হয়ে সারা দেহে বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আর কার্বামাইনো হিমোগ্লোবিনসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুস যায়। উপরোক্ত কাজ ছাড়াও হিমোগ্লোবিন বাফার হিসেবে কাজ করে রক্তে P^H নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ভেঙ্গে পিত্তের প্রধান রঞ্জক সৃষ্টি করে।

☒ **রক্তচাপ কি? এটা কত প্রকার কি কি? ব্যাখ্যা করুন? রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম লিখুন?** **(১১তম ও ২৫তম BCS)**

রক্তচাপ ঃ হৃদযন্ত্র থেকে রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনীতে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ দুই ধরণের যথা –

ক) সিস্টোলিক চাপ।
খ) ডায়াস্টোলিক চাপ।

সিস্টোলিক চাপ ঃ হৃদপিন্ডের সংকোচণকে সিস্টোল বলে। সিস্টোল অবস্থায় ধমণীতে যে চাপ থাকে তাকে সিস্টোলিক চাপ বলে। স্বাভাকি অবস্থায় সিস্টোলিক চাপ পারদ স্তম্ভের ১০০–১৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

ডায়াস্টোলিক চাপঃ হৃদয়ন্ত্রের প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলা হয়। ডায়াস্টোল অবস্থায় ধমনীতে রক্তের চাপকে ডায়াস্টোলিক চাপ বলা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদস্তম্ভের ৬৫–৯০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক স্বাভাবিক মানুষের সিস্টোলিক চাপ ১২০ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৮০।

রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নামঃ রক্তচাপ মাপা হয় স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphigmomenometer).

Scanned by CamScanner

Teacher Work | রক্ত, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, উচ্চরক্তচাপ, Heart Attack, Stroke

- ❑ রক্ত-গঠন উপাদান, কণিকা ও গ্রুপ
- ❑ কোলেস্টেরল
- ❑ উচ্চরক্তচাপ
- ❑ Heart Attack
- ❑ Stroke
- ❑ Coronary Angiography
- ❑ Coronary-by-Pass
- ❑ Angioplasty
- ❑ Myocardial Infarction

Student Work | রক্ত, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, উচ্চরক্তচাপ, Heart Attack, Stroke

☒ রক্ত কি? রক্তের কাজ কি?

রক্ত ঃ কোষ বহুল, সামান্য লবণাক্ত, ক্ষারধর্মী লাল বর্ণের যে ঘন তরল পদার্থ হৃৎপিন্ড ধমনী, শিরা ও রক্ত জালকের মধ্যে দিয়ে সতত প্রবাহমান তাকে রক্ত বলে। রক্ত হলো এক ধরনের তরল যোজক কলা।

এটি রক্তরস এবং রক্তকণিকার সমন্বয়ে গঠিত। রক্তের প্রায় ৫৫ শতাংশই রক্তরস এবং ৪৫ শতাংশ রক্ত কণিকা, মানবদেহে এই রক্ত A, B, AB, এবং O এই চারটি গ্রুপে বিভক্ত।

রক্তের কাজঃ

i) অক্সিজেন পরিবহন।
ii) কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহন।
iii) খাদ্যরস পরিবহন।
iv) হরমোন পরিবহন।
v) পানিসাম্য নিয়ন্ত্রন।
vi) দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রন।
vii) এসিড ক্ষ্যার সাম্যবস্থা।
viii) বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশন।
ix) প্রোটিন সঞ্চয় ও এলার্জি রোধ।

☒ রক্তের উপাদান কি কি? বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন?

রক্ত ঃ দু'প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যথাঃ

১. রক্তরস (৫৫%) ও
২. রক্তকণিকা (৪৫%)

বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কাজ ঃ

১. রক্তরস ঃ

গঠন ঃ রক্তরসে ৯০ – ৯২% জলীয় অংশ এবং ৮ – ১০% বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে গঠিত রক্তরসে তিন প্রকার পদার্থ থাকে। যথা–

ক) অজৈব্য পদার্থ (সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি)
খ) জৈব্য পদার্থ (শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদি)
গ) গ্যাসিয় পদার্থ (অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি)

Scanned by CamScanner

কাজ ঃ

i) রক্তরস রক্তকণিকা ধারণ করে।
ii) দূষিত পদার্থ অপসারণ করে।
iii) হজমকৃত খাদ্যবস্তু, কার্বন ডাই অক্সাইড ইউরিয়া, হরমোন ইত্যাদি।
iv) পানি ও তাপের সমতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

২. রক্তকণিকা ঃ মানুষের রক্তে তিন ধরণের রক্তকণিকা থাকে।

ক. লোহিত কণিকা বা এরিথ্রোসাইট।
খ. শ্বেতকণিকা বা লিউকোসাইট।
গ. অনুচক্রিকা বা থ্রোম্বসাইট।

রক্তকণিকা	বৈশিষ্ট্য	কাজ
লোহিত কণিকা	i) নিউক্লিয়াসবিহীন ii) হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে	i) অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে ii) অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করে।
শ্বেত কণিকা	i) নিউক্লিয়াসযুক্ত ii) লোহিতকণিকা বড় অপেক্ষা	i) জীবাণু ধ্বংস করে ii) দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে।
অনুচক্রিকা	i) নিউক্লিয়াস থাকে না ii) সবচেয়ে ক্ষুদ্ররক্ত কণিকা	i) রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে।

প্র হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন?

হৃদপেশী দ্বারা তৈরি হৃদযন্ত্র একটি পাম্প যন্ত্র বিশেষ। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে আনিত রক্ত, ধমনীর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করা এ যন্ত্রের কাজ। হৃদযন্ত্র চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ঃ

১) ডান অলিন্দ। ২) বাম অলিন্দ। ৩) ডান নিলয়। ৪) বাম নিলয়।

হৃদপিন্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতিঃ অলিন্দ ও নিলয়ের সংকোচন ও প্রসারণের ফলেই হৃদযন্ত্রের রক্তসঞ্চালন সংঘটিত হয়। Co_2 সমৃদ্ধ রক্ত দেহ থেকে উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে ফুসফসীয় শিরা পথে বাম অলিন্দে আসে।

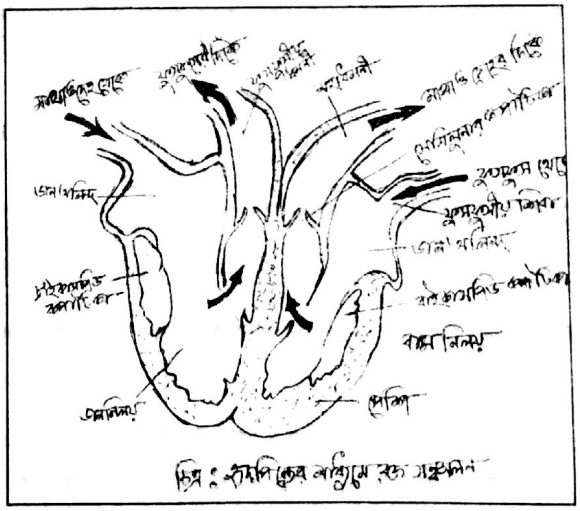

চিত্র ঃ হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন

অলিন্দদ্বয় সংকুচিত হলে রক্ত ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এরপর নিলয় দুইটি সংকুচিত হলে রক্তের চাপে একদিকে বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা দ্বারা বাম ও ডান অলিন্দ নিলয় ছিদ্র পথ বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে ফুসফুসীয় ধমনী ও মহাধমনীর মুখের অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা খুলে যায়। ফলে বাম নিলয়ের অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত মহাধমনীর মাধ্যমে সারা দেহে এবং ডান নিলয়ের কার্বন ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে যায়। এভাবে হৃদযন্ত্রের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

Scanned by CamScanner

☒ সংজ্ঞা লিখুন ঃ ধমনী, শিরা, রক্তজালক বা কৈশিক নালী?

ধমনী ঃ ধমনী হৃদপিন্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের সকল অঙ্গে সাধারণত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। এরা দেহের ভেতরের দিকে অবস্থিত। ধমনীর প্রাচীর পুরু এবং ধমনী গহ্বরে কপাটিকা থাকে না।

শিরা ঃ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে উৎপত্তি হয়ে সাধারণত কার্বডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ হৃদযন্ত্রের দিকে পরিবহন করে। শিরার প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং এদের গহ্বরে প্রাচীর পাত্রে কপাটিকা থাকে।

রক্তজালক বা কৈশিক নালীঃ ধমনী ক্রমান্বয়ে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অতি সুক্ষ্ম নালী তৈরি করে। এ সকল সূক্ষ্ম নালীকে কৈশিক নালী বলে। কৈশিক নালী দেহ কোষের চারিপাশে থাকে এবং মাত্র একস্তর কোষ দ্বারা এদের প্রাচীর গঠিত, কৈশিক নালী থেকে শিরার উৎপত্তি।

☒ ব্যাখ্যা করুন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ রক্তদান করলে নিজের কোন ক্ষতি হয় না?

রক্তের কোন বিকল্প নেই। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে ৫-৬ লিটারের বেশি রক্তের প্রয়োজন নেই। কোন ব্যক্তি রক্তদান করলে তা ৪ মাসের মধ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। ৪ মাস পর আবার রক্ত না দিলে অতিরিক্ত রক্ত নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। যারা রক্ত দেন না তাদের প্রতিদিন বিশ হাজার কোটি লোহিত রক্তকণিকা তৈরি ও ধ্বংস হয়। এভাবে যে কোন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতি চার মাস অন্তর রক্ত দিতে পারে। এতে নিজের কোন ক্ষতি হয় না। অপরদিকে একটি মূল্যবান জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়।

☒ ব্লাড ব্যাংক কি?

যে স্থানে ৪° সে. থেকে ৬° সে তাপমাত্রায় রক্ত সংরক্ষণ করা হয় তাকে ব্লাড ব্যাংক বলা হয়। সংরক্ষিত রক্ত রোগীর প্রয়োজনে শরীরে প্রয়োগ করা হয়।

☒ এনজিওগ্রাফি (Angiorgaphy) কি? এনজিওগ্রাম পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।

এনজিওগ্রাফি : এনজিওগ্রাফি হলো এমন একটি প্রতিবিম্ব তৈরির পরীক্ষা যেখানে শরীরের রক্তনালিকাসমূহ দেখার জন্য এক্সরে ব্যবহার করা হয়। এ পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তবাহী শিরা বা ধমনীগুলো সরু, ব্লক ও প্রসারিত হয়েছে কি না তা নির্ণয় করা যায়। রক্তনালিতে ব্লক এবং রক্তনালি সরু এবং অপ্রশস্ত হলে শরীরে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নি হয়।

এনজিওগ্রাম পদ্ধতি : এনজিওগ্রাম করার সময় চিকিৎসক রোগীর দেহে একটি তরল পদার্থ একটি সরু ও নমনীয় নলের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেন। তরল পদার্থটিকে 'ডাই' এবং নলটিকে ক্যাথেটার বলে। এই ডাই ব্যবহারের ফলে রক্তবাহী নালিকাগুলো এক্সরের সাহায্যে দৃশ্যমান দেখা যায়। এই ডাই পরে কিডনি এবং মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। একটি নির্দিষ্ট প্রবেশ বিন্দুর মধ্য দিয়ে ক্যাথেটারটিকে নির্দিষ্ট ধমনী বা শিরার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। প্রবেশ বিন্দুটি শরীরের যে কোনো স্থানের রক্তনালিতে হতে পারে। ব্যবহৃত ডাইটিকে কখনো কখনো বৈসাদৃশ্য বা Contrast হিসেবে অভিহিত করা হয়।

BCS প্রশ্নাবলী ‖ HIV/ AIDS

☒ HIV কি? AIDS কি? HIV/ AIDS কিভাবে ছড়ায়? এর রোগের আক্রমণের লক্ষণ ও প্রভাব আলোচনা করুন। কিভাবে HIV/ AIDS প্রতিরোধ করা সম্ভব? **(২৯, ২৭, ২৪, ২৩, ১৫ ও ১০তম BCS)**

HIV t 'Human Immunodeficiency Virus' নামটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এইচআইভি (HIV) । এই ভাইরাস দেখতে গোলাকার। এর অভ্যন্তরে এক সূত্রক RNA বিদ্যমান। এটি এমন এক বিশেষ প্রজাতির ভাইরাস যা শরীরে প্রবেশ করলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরণের ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

AIDSt AIDS-এর পূর্ণরূপ Acquired Immune Deficiency Syndrome। AIDS ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। Human Immunodeficiency Virus (HIV) এ রোগের কারণ। ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম AIDS রোগী সনাক্ত করা হয়।

Scanned by CamScanner

HIV/ AIDS এর বিস্তারঃ নিম্নোক্ত উপায়ে HIV/ AIDS ছড়াতে পারে -

ক) আক্রান্ত পুরুষ অথবা মহিলা সাথে অরক্ষিত যৌন মিলনের মাধ্যমে।
খ) আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে গ্রহণের মাধ্যমে।
গ) আক্রান্ত ব্যক্তির সিরিঞ্জ, রেজার, ব্লেড বা ক্ষুর জীবাণুমুক্ত না করে পুনরায় ব্যবহার করলে।
ঘ) আক্রান্ত মা থেকে গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে অথবা বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর শরীরে।

HIV/ AIDS এর লক্ষণ ও ক্ষতিকর প্রভাবঃ

ক) মাঝে মাঝে ছোট খাটো জ্বর, মাথাব্যথা ও দৃষ্টি শক্তিহানি।
খ) গলা, বগল ও কুচকীর ব্যথাহীন গ্রন্থি ফুলে যাওয়া।
গ) শুকনো কাশি, নিঃশ্বাসে কষ্ট, গলাব্যথা বিশেষ করে খাবার সময়ে।
ঘ) মুখের ভিতর, জিভে ও ঠোটে সাদা পর্দা পড়া।
ঙ) সীমাহীন দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তিহীনতা।
চ) অনিদ্রা, রাতে গা ঘামা ও ওজন হ্রাস।
ছ) হজম শক্তি কমে যাওয়া।
জ) পিঠে মুখে গলায় ফুসকুরি। চামড়ায় বিভিন্ন স্থানে লালচে দাগ। কোনো ব্যথা নেই কিন্তু ভেতরটা শক্ত এবং দেখতে বিশ্রী।

HIV/ AIDS এর প্রতিকারঃ এ রোগের কোনো প্রতিকার না থাকলেও এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেমন-

ক) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
খ) বহুগামিতা ও পতিতালয়ে যাতায়ত পরিহার করা। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করা।
গ) রক্ত, রক্তজাত দ্রব্য বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহণের পূর্বে HIV/AIDS পরীক্ষা করে নেয়া।
ঘ একবার ব্যবহারযোগ্য সিরিঞ্জ (ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ), নতুন ব্লেড ব্যবহার করা অথবা ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, রেজার, ক্ষুর জীবাণুমুক্ত করে নেয়া।
ঙ) এইডস আক্রান্ত মায়ের দ্বারা তার শিশুর সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আক্রান্ত হলে গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকা।

Teacher Work : HIV/ AIDS

❑ HIV/ AIDS

BCS প্রশ্নাবলী : ক্যান্সার ও ক্যান্সার-চিকিৎসা

☒ কেমিওথেরাপি কি? ইহা কেন ব্যবহার করা হয়? **(৩৩ ও ১০তম BCS)**

রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে চিকিৎসা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি হল কেমোথেরাপি। এর জনক হলেন জার্মান চিকিৎসক পল এহর্লিক। সাধারণত জীবানুর সংক্রমন এবং ক্যান্সারের জন্য কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ প্রয়োগে ক্যান্সারের চিকিৎসাকে কেমোথেরাপি বলে। ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ যখন দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তখন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব হয় না। এজন্য কোমাথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

☒ ব্লাড ক্যান্সার কত প্রকার? এর চিকিৎসা সম্পর্কে লিখুন। **(৩১তম BCS)**

ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া, রক্তের একটি অতি মারাত্মক রোগ, যেখানে রক্তকোষের অনিয়ন্ত্রিত এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে, যা অস্থিমজ্জা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গে বিস্তার লাভ করে। আমরা জানি, রক্তে তিন ধরণের কণিকা আছে- লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা। ব্লাড ক্যান্সারে যে কোনো ধরণের কণিকাই আক্রান্ত হতে পারে।

Scanned by CamScanner

প্রকারভেদ ঃ লিউকোমিয়া সাধারণত দু' ধরণের- একিউট (Acute) ও ক্রনিক (Chronic)। প্রথমটি দ্রুত প্রসারমান এবং সাধারণত ছোটদের বেশি হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি ধীরগতিতে প্রসারমান ও বড়দের বেশি হয়।

কারণসমূহ ঃ ব্লাড ক্যান্সারের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনো আবিস্কৃত হয়নি। তবে রক্তকোষ বিভাজনের সময় জিনগত ত্রুটি বা Mutation-এর ফলেই ক্যান্সারের উৎপত্তি। এ ত্রুটি বা Mutation-এর জন্য রেডিয়েশন (Radiation), বিভিন্ন কেমিক্যালস (যেমন- বেনজিন), ভাইরাস (যেমন- $HTLV_1$) ড্রাগস ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়ে থাকে।

লক্ষণসমূহ ঃ সাধারণত জ্বর, কাশি, শরীর ব্যথা (বিশেষ করে হাড় এবং জয়েন্ট), দুর্বলতা,রক্তক্ষরণ (নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে বা মাসিকের মতো) ইত্যাদি উপসর্গেই রোগীরা ভোগে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থিসমূহ ফুলে যেতে পারে, রক্তবমি হয় বা পায়খানার রাস্তা দিয়েও রক্ত যেতে পারে। প্রায় সব রোগীই রক্তশূন্যতায় ভোগে তাই ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করে।

ব্লাড ক্যান্সরের চিকিৎসা ও করণীয় ঃ রক্তের PBHF এবং Bone marrow পরীক্ষার মাধ্যমে অতি সহজেই ব্লাড ক্যান্সার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে ব্লাড ক্যান্সারের প্রায় সব চিকিৎসা সম্ভব (কেবল বোন ম্যারো প্রতিস্থাপন ছাড়া) এবং অত্যন্ত সফলভাবে চালু আছে। চিকিৎসা সাধারণত দু ধরণের- ১. ক্যান্সার কোষ নির্মূল করার চিকিৎসা; যেমন- কেমোথেরাপি, অস্থিমজ্জা ও রক্তকোষ প্রতিস্থাপন, ২. উপসর্গসমূহের চিকিৎসা; যেমন- রক্ত পরিসঞ্চালন, বিভিন্ন প্রকার ইনফেকশন দূর করা এবং পুষ্টি নিশ্চিত করা।

☒ কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য কাকে বলে? এরা কিভাবে রোগ তৈরি করে? **(২৭তম BCS)**

কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য (Carcinogenic Chemical Substance) ঃ যেসব রাসায়নিক দ্রব্য শরীরে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে তাদেরকে কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য বলে। অ্যাস্‌বেস্টস (Asbestos), বেনজিন, তামাক ইত্যাদি হলো কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্যের উদাহরণ।

কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা শরীরে রোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ঃ কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্যগুলো শরীরে প্রবেশ করে কোষীয় মেটাবলিজম (Metabolism) প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায় অথবা কোষের DNA-কে সরাসরি ধ্বংস করে ফেলে। এর ফলে কোষের জৈব প্রক্রিয়া (Biological Process) প্রভাবিত হয় এবং শুরু হয় অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন। এই অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজনের ফলেই সৃষ্টি হয় ক্যান্সার।

☒ **ক্যান্সার কোষের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ কোষের পার্থক্য মূলত কি?** **(১৩ তম BCS)**

ক্যান্সার কোষের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ কোষের পার্থক্য হচ্ছে ক্যান্সার কোষের বিভাজন প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক এবং অনিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে স্বাভাবিক কোষের বিভাজন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রিত।

Teacher Work — ক্যান্সার ও ক্যান্সার-চিকিৎসা

❑ Cancer ❑ Chemotheraphy ❑ Radiotherapy

Student Work — ক্যান্সার ও ক্যান্সার-চিকিৎসা

ক্যান্সার

অপ্রত্যাশিতভাবে দেহের কোনো নির্দিষ্ট অংশের কোষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, দ্রুতহারে, ক্রমাগত বিভাজনের (Cell division) ফলে যে জৈবনিক ক্রিয়াকলাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তাকে ক্যান্সার বলে। অর্থাৎ ক্যান্সার এমন এক ভয়াবহ ব্যাধি বা ব্যাধির সমষ্টি যার ফলে দেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানের কোষ কোনো কারণে স্বাভাবিক বিভাজন বা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণে সাড়া দিতে অক্ষম হয় এবং ক্রমান্বয়ে বিভাজিত হয়ে অনেক কোষের সৃষ্টি করে পার্শ্ববর্তী কলাকে বিনষ্ট করে এবং আব বা মিউ (Tumour)-এর আকারে স্ফিতি সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, টিউমারের আশেপাশে পুষ্টির পর্যাপ্ত এই বিভাজন চলতেই থাকে।

Scanned by CamScanner

☒ **রেডিওথেরাপি কি? কয় ধরনের ও কি কি?**

রেডিওথেরাপি শব্দটি ইংরেজি 'Radiation Therapy' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ। যেমন-ক্যান্সার, থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক প্রকৃতি, রক্তের কিছু ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় সাধারণত রেডিওথেরাপি উচ্চশক্তিসম্পন্ন এক্সরে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। এটি টিউমার কোষের অভ্যন্তরস্থ ডিএনএ (DNA)-কে ধ্বংসের মাধ্যমে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলে। মূলত এটি হলো কোনো রোগের চিকিৎসায় আয়নসৃষ্টিকারী (তেজস্ক্রিয়) বিকিরণের ব্যবহার।

রেডিওথেরাপি দুই ধরনের: (১) বাহ্যিক বীম বিকিরণ ও বাহ্যিক রেডিওথেরাপিপ (২) অভ্যন্তরীণ রেডিওথেরাপি।

BCS প্রশ্নাবলী — রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা

☒ **ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার এর লক্ষণসমূহ কি কি? এর চিকিৎসা উল্লেখ করুন।** (৩৪তম বিসিএস)

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার এর লক্ষণসমূহ :

০১. রোগীর তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়।
০২. ৩-৭ দিনের মধ্যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে জটিলতা দেখা যায় অথবা বিকল হয়ে পড়ে।
০৩. রক্তনালীতে চামড়ার নিচে রক্ত জমাট বাঁধে।
০৪. দাঁতের গোড়া দিয়ে অথবা দেহের যে কোনো স্থান দিয়ে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয়।
০৫. রক্তবমি হয় ও মলদ্বার দিয়ে রক্ত যায়।
০৬. মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের মত রক্তক্ষরণ হয়।
০৭. লিভার বড় হয়ে, পেট বা ফুসফুসে পানি জমতে পারে।
০৮. এছাড়াও সাধারণ ডেঙ্গুজমাট উপসর্গগুলো দেখা যায়।

চিকিৎসা : রক্তক্ষরণ, রক্তজমাট বাঁধা, রক্ত সংবহনতন্ত্রের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট এক জটিল অবস্থার জন্য রোগীকে হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভর্তি করতে হয়।

☒ **Anthrax কি? এ রোগের উৎস, বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।** (৩০তম বিসিএস)

অ্যান্থ্রাক্স ঃ অ্যান্থ্রাক্স এক ধরনের জীবাণু। এটি মূলত বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়া Bacillus Unthracis। এরা দেখতে দণ্ডাকার ও গ্রাম পজিটিভ (+ve) ব্যাকটেরিয়া। জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কচ (Koch) এটি আবিষ্কার করেন।

এশিয়ার কিছু অংশ, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় জীবজন্তুদের এই রোগ হয়। ১৯৪০ সালে ব্রিটেন প্রথম জীবাণু অস্ত্র হিসেবে অ্যান্থ্রাক্সের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। ১৯৫০ ও ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সামরিক বাহিনীতে অ্যান্থ্রাক্স ব্যবহার শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অ্যান্থ্রাক্স মূলত পশুপাখির একটি রোগ। মানুষের শরীরে এ রোগ সংক্রমণের ঘটনা বিরল। দীর্ঘ সময়ে নিজে থেকেই জীবাণুটি জন্মলাভ করে। পরিবেশে এই জীবাণু বেঁচে থাকে দীর্ঘদিন। যে সব পশু ঘাস-পাতা খেয়ে বাঁচে তারাই এ জীবাণুতে বেশি আক্রান্ত হয়। কারণ, মাটিতে ঘাসের সাথে এ জীবাণু আটকে থাকে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের পাবনা ও সিরাজগঞ্জ এলাকায় এ রোগের প্রকোপ দেখা দেয়।

বিস্তার ঃ সাধারণত অতিথি পাখির মাধ্যমে এটি মানুষের সন্নিকটে আসে। অ্যান্থ্রাক্স জীবাণুতে সংক্রমিত পশুপাখি কিংবা তাদের মাংস দ্বারা প্রস্তুত কোন খাবার থেকে মানুষের মধ্যে এই রোগ দেখা দিতে পারে। ত্বকের সংস্পর্শেও হতে পারে অ্যান্থ্রাক্স। বিরল প্রজাতির পশুপাখির মাংস খাওয়া থেকেও অ্যান্থ্রাক্স রোগ হয়। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমেও অ্যান্থ্রাক্স ছড়ায়।

অ্যান্থ্রাক্স এর প্রকারভেদ ঃ কিউটেনিয়াস, গ্যাস্ট্রো ইনটেসটিনাল ও পালমোনারী ইনহ্যালিশন-এই তিন ধরনের এন্থ্র্যাক্স রয়েছে।

অ্যান্থ্রাক্স এর লক্ষণ ঃ ত্বকে অ্যান্থ্রাক্স সংক্রমিত হলে শরীরে দু' একদিন পর ছোট দানা দানা গুটি দেখা দেয়। এরপর স্থানটি কালো হলে যায়। আন্ত্রিক সংক্রমণে ক্ষুধামন্দা ও বমি বমি ভাব দেখা দেয়। একই সঙ্গে প্রচণ্ড পেট ব্যথা হয়। রক্তবমিও হতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসে সংক্রমিত অ্যান্থ্রাক্সে প্রথম অবস্থায় জ্বর, গায়ে ব্যথা, সর্দিকাশি দেখা দেয়। চিকিৎসা না হলে দু'এক সপ্তাহে তীব্র শ্বাসকষ্ট হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগী মারা যায়।

Scanned by CamScanner

অ্যান্থ্রাক্স এর প্রভাব ঃ মানুষের শরীরে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু প্রবেশ করামাত্রই তা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই শরীরে অ্যানথ্রাক্স টক্সিনের জন্ম দেয়। সাধারণত ৬ দিনের মধ্যে রোগ চরমে পৌছে। পালমোনারি অ্যানথ্রাক্সের ক্ষেত্রে সাধারণ সময়সীমা ৬০ দিন। এটাই সবচেয়ে মারাত্মক। আক্রান্ত হওয়ার ২ দিনের মধ্যে ব্যক্তি মারা যায়। চরম পর্যায়ে ১০৩-১০৪ ডিগ্রী পর্যন্ত জ্বর হয়। বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ভয়ংকর আকার ধারণ করে। গ্যাস্ট্রো ইনটেসটিনাল অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত ২৫ শতাংশ রোগী মারা যায়। এক্ষেত্রে জ্বর, রক্ত বমি ও তলপেটে ব্যথা লক্ষণ হিসেবে দেখা দেয়। কিউটেনিয়াস অ্যানথ্রাক্স সবচেয়ে কম ক্ষতিকর। সময়মত অ্যান্টিবায়োটিক খেলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা যায়। অ্যানথ্রাক্স টক্সিন এতই ভয়াবহ যে, জীবাণুর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনার পরও তা ক্ষতি করতে পারে । অ্যানথ্রাক্স ব্যাকটেরিয়া এতটাই বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে যে সেটা রক্তে মিশে রক্তক্ষরণ ঘটায় এবং টিস্যু খসে পড়ে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ঃ সাবধানতাই এর প্রধান প্রতিরোধক। এছাড়া নাকে মুখে মুখোশ ব্যবহারের মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা যায়। অ্যানথ্রাক্স সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিক জীবাণু সংক্রমণ পরীক্ষা করতে হবে এবং দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসা হিসেবে এন্টিবায়োটিক ডক্সিসাইক্লিন ও সিপ্রো (সিপ্রোফ্লোক্সেসিন) গ্রহণ করা যেতে পারে। শরীরে দীর্ঘ সময় এই জীবাণু থাকে বলে ৬০ দিন এন্টিবায়োটিক চিকিৎসা নিতে হয়। তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জীবাণু সন্ত্রাসের অস্ত্র হিসেবে অ্যানথ্রাক্স ঃ অ্যানথ্রাক্সকে জীবাণু সন্ত্রাসের জন্য যথার্থ বলে চিহ্নিত করা হয়। এর প্রধান কারণ হলো এটি ছোঁয়াচে নয়। উপরন্তু এই জীবাণু দীর্ঘ সময় সক্রিয় থাকতে পারে। ১৯৪০ সালে ব্রিটেন প্রথম জীবাণু অস্ত্র হিসাবে অ্যানথ্রাক্সের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিচালিত এমন একটি জীবাণু হামলা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দীর্ঘ ৪২ বছর সে জীবাণু বেঁচে ছিল।

☒ হেপাটাইটিস কি? এটি কি কারণে হয়? এর জন্য দায়ী জীবাণু কত রকমের হয়? কোন জীবাণুগুলো রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়? (৩০ ও ২৭তম BCS)

হেপাটাইটিস ঃ যকৃতের আরেক নাম হেপাটিকা; যকৃতের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। ভাইরাস অথবা অ্যান্টিবায়োটিকের আক্রমণে যকৃতের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে হেপাটাইটিস বলে। হেপাটাইটিস-বি অত্যন্ত মারাত্মক। এ রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হেপাটাইটিসের কারণ ঃ হেপাটাইটিস প্রধানত কয়েকটি প্রজাতির হেপাটাইটিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি। যকৃতে (Liver) ইনফেকশনের কারণে হয়ে থাকে। আবার কোনো কারণে যকৃতের কোষগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে ভাঙতে থাকলে হেপাটাইটিস দেখা দেয়। যেমন- অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক সেবন, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন ও ম্যালেরিয়া জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে যকৃতের কোষগুলোর অতিমাত্রায় ভাঙ্গনের ফলে হেপাটাইটিস সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কোনো কারণে পিত্তনালী অবরুদ্ধ বা বন্ধ হয়ে গেলেও অবস্ট্রাকটিক (Obstructive) হেপাটাইটিস দেখা দেয়।

হেপাটাইটিসের জন্য দায়ী জীবাণু ঃ হেপাটাইটিস প্রধানত পাঁচ প্রকারের হেপাটাইটিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যথা ঃ হেপাপাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, হেপাটাইটিস-ডি ও হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস। এছাড়াও সাইটোমোলো ভাইরাস ও হার্পিস ভাইরাসের কারণেও হেপাটাইটিস হয়ে থাকে।

হেপাটাইটিসের জীবাণু সংক্রামণ ঃ

ক) রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিত হেপাটাইটিস ভাইরাস ঃ হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়।

খ) খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রমিত হেপাটাইটিস ভাইরাস ঃ হেপাটাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস খাবার ও পানির মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়।

☒ খাবার স্যালাইনে ব্যবহৃত চিনি/গুড়া ও লবণের প্রয়োজন কি? (২৭তম BCS)

কোনো ব্যক্তি ডায়রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে তার শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও বিভিন্ন ধরণের লবণ বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে লবণ ও পানির অভাব দেখা দেয় এবং শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। লবণের এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য খাবার স্যালাইনে ধাতব লবণ ব্যবহৃত হয়। আবার চিনি ও গুড় হচ্ছে কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাবার, যা দেহে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। যেহেতু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, সেজন্য তার শরীরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য চিনি বা গুড় খাবার স্যালাইনের সাথে ব্যবহৃত হয়।

☒ ডেঙ্গু রোগে রক্তের কোন কণিকা ভেঙে যায়? এই রোগ কিভাবে বাহিত হয়? (২৫তম BCS)

ডেঙ্গু এডিস মশাবাহিত একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমণে মানব দেহের রক্তের প্লেটলেটের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। বিশেষ করে হেমোরেজিক ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত ক্ষরণ হয় এবং রক্তের প্লেটলেট দ্রুত হ্রাস পায়। এতে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উল্লেখ্য মানব দেহের রক্তে প্রতি কিউবিক মিলি মিটারে প্লেটলেটের স্বাভাবিক পরিমাণ হল দেড় লক্ষ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ।

Scanned by CamScanner

জীবাণু বহনকারী মশার নাম ঃ এডিস

প্রকারভেদ ঃ ক্লিনিক্যাল ও হেমোরেজিক

এডিস মশা কোথায় জন্মায় ঃ ফুলের টব, ভাঙ্গা হাঁড়ি-পাতিল, গাড়ির টায়ার ইত্যাদির মধ্যে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা জন্মায়।

ডেঙ্গু জ্বরের বিস্তার ঃ ডেঙ্গু ফিভার বা জ্বর এক ধরনের ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। শারীরিক দুর্বলতা, ফুসকুড়ি ও লসিকাগ্রন্তি ফুলে যাওয়া এ রোগের উপসর্গ। এডিস ইজিপটি নামক মশা এ ভাইরাসের বাহক। এ মশার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা সাধারণত দিনের বেলা কম আলোতে মানুষকে কামড়ায়, গরম কালে শহর এলাকায় জলাবদ্ধ স্থানে এরা বংশবিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে গরমকালেই এদের বংশবিস্তার বেশি হয়ে থাকে। এ ভাইরাসকে ডেঙ্গু ভাইরাসও বলা হয়। ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী মশা যাদেরকে কামড়ায় তারাই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। এছাড়াও এ মশা কোনো আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ানোর পরে কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তিও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। তাই বলা যায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তব্যক্তিও এ রোগ ছড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ ঃ

- ❑ শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে ১০৪-১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
- ❑ মাথাব্যথা, মাংসপেশী, চোখের পিছনে এবং হাড়ে বিশেষ করে মেরুদন্ডে ব্যথা।
- ❑ বমি বমি ভাব।
- ❑ চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ।
- ❑ কালো রঙের পায়খানা।

ডেঙ্গু জ্বরের প্রতিকার ঃ

- ❑ লক্ষণগুলো দেখা দিলেই রক্ত পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।
- ❑ জ্বর বেশী হলে ভেজা কাপড় দিয়ে গা মুছে দিন।
- ❑ রোগীকে বেশী করে তরল খাবার খাওয়ান।

প্রতিরোধ ঃ প্রত্যেকটি রোগেরই প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা বেশী কার্যকর। সুতরাং ডেঙ্গুজ্বরের প্রতিরোধ করতে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমনঃ

- ❑ ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার উৎস ধ্বংস করতে হবে।
- ❑ ফুলের টব পরিষ্কার রাখতে হবে।
- ❑ পানি যাতে কোথাও জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ❑ বাড়ীর আশপাশ ও আঙিনা পরিষ্কার রাখতে হবে।
- ❑ রাতের বেলা মশারি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দিনের বেলাও মশারি ব্যবহার করতে হবে।

☒ ডায়রিয়ায় ডাবের পানি উত্তম কেন? **(২৫ তম BCS)**

ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর ঘনঘন পাতলা পায়খানা ও বমির ফলে শরীরের প্রয়োজনীয় পানি ও অত্যাবশ্যকীয় খনিজ লবণের অভাব দেখা দেয়। ডাবের পানিতে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং কিছুটা গ্লুকোজও থাকে। এসব রাসায়নিক পদার্থের সাথে কিছুটা সোডিয়ামও বিদ্যমান। অন্য কোনো পানীয়তে এত সব উপাদান নেই। এজন্য ডায়রিয়া হলে ডাবের পানি অত্যন্ত উপকারী।

☒ জলাতঙ্ক কি? এর কারণ ও প্রতিকারের উপায় উল্লেখ করুন। **(২২তম BCS)**

জলাতঙ্ক ভাইরাস সংক্রমিত রোগ। কুকুর, বিড়াল, শিয়াল, বাঁদর, প্রভৃতির কামড়ানোর ফলে এই রোগ হতে পারে। বিশেষ করে পাগলা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। কামড়ানোর প্রথম দিকে জ্বালা এবং ব্যথা ছাড়া আর কিছুই লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কিন্তু ১০-১৫ দিন পরে জ্বর জ্বর ভাব, প্রলাপ, খিঁচুনী, ক্ষিপ্ত মেজাজ, চোখের রক্তিম ভাব জলীয় এবং চকচকে পদার্থ ইত্যাদি দেখে ভয় পাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। জলাতঙ্ক রোগ হলে প্রথমে Spasm দেখা দেয় বলে প্যারাল্ডিহাইড ইনজেকশন দিতে হয় এবং জলাতঙ্কের প্রতিষেধক হিসাবে Anti Rabies Vaccine দিতে হয়। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এ প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন।

Scanned by CamScanner

☒ পাতলা পায়খানা হলে স্যালাইন খাওয়ানো হয় কেন? **(২০ তম BCS)**

ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হলে ডিহাইড্রেশন হয় ও শরীরে ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ কমে যায়। তাই শরীরে পানি ও ইলেকট্রোলাইটের অভাব পূরণ করার জন্য স্যালাইন খাওয়ানো হয়। এতে দেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা পায় এবং কোষের ভিতর ও বাইরের তরল পদার্থের চাপ ঠিক থাকে। স্যালাইন হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট, গ্লুকোজ ও পানি দিয়ে তৈরি। কলেরা বা ডায়ারিয়ায় মারা যাওয়ার মূল কারণই হলো এ অবস্থায় রোগী পায়খানা ও বমির ফলে দ্রুত ইলেকট্রোলাইট হারাতে থাকে, যা খাবার স্যালাইন পূরণে সক্ষম।

☒ পাইয়োরিয়া ও ফাইলেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? **(১৭তম BCS)**

পাইয়োরিয়া ঃ পাইয়োরিয়া হচ্ছে দন্তরোগ। এ রোগের ফলে দাঁতের মাড়ি ফুলে যায় এবং পুঁজ পড়ে। মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। দাঁত ব্রাস করলে রক্ত ঝরে এবং পরিণামে দাঁত আলগা হয়ে যায়।

ফাইলেরিয়া ঃ নেমাটোড নামীয় সুতার মতো কীটের এক বা একাধিক প্রজাতির আক্রমণে ফাইলেরিয়া রোগ হয় । অনেক মনে করেন এটা এক বিশেষ ধরনের মশা বা মাছি দ্বারা আক্রান্ত সংক্রমিত রোগ। এই রোগ হলে প্রচণ্ড জ্বর ও শরীরের গিট ফুলে যায় এবং প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়।

☒ ডায়রিয়া হলে যে লবণ গুড়ের শরবত খাওয়ানো হয়, তাতে লবণ ও গুড়ের (অথবা চিনির) ভূমিকা কি? **(১৩তম BCS)**

লবণ গুড়ের শরবতে বিদ্যমান লবণ রক্তে প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ ধরে রাখে। অপরদিকে গুড় বা চিনি রক্তে শর্করার সরবরাহ নিশ্চিত করে, যা পরবর্তীতে দহনের ফলে শক্তিতে পরিণত হয়ে মানবদেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।

☒ কি ত্রুটির জন্য বহুমুত্র রোগ হয়? **(১১তম BCS)**

ডায়াবেটিস ঃ রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ীভাবে বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় ডায়াবেটিস। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি হলে তা প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে আসে। এই রোগ বংশগত বা পরিবেশগত কারণে হতে পারে। ডায়াবেটিস একটি বিপাকজনিত রোগ।

কারণঃ অগ্নাশয়ে আইলেটস অব ল্যাঙ্গার হ্যান্স থেকে নিঃসৃত ইনসুলিন নামক হরমোন গ্লুকোজের পরিমান কাম্য মাত্রায় ধরে রাখে। কোন কারনে এই অতীব প্রয়োজনীয় ইনসুলিন পরিমিত মাত্রায় নিঃসৃত না হলে বা একেবারেই নিঃসৃত না হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ক্রমাগত হারে বাড়তে থাকে। ফলে ঘন-ঘন প্রস্রাব, সীমাহীন দুর্বলতা, অধিক ও ঘন ঘন খাবার ইচ্ছা সহ যে রোগটির জন্ম হয় সেটিই বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস।

লক্ষণ ঃ ডায়াবেটিস হলে সাধারনত নিচের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়:

১. অধিক পিপাসা ও অতিরিক্ত ক্ষুধা পায়।
২. অত্যধিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি বোধ।
৩. শরীরের ওজন কমে যায়।
৪. বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ হয় এবং যা তাড়াতাড়ি শুকায় না।
৫. চোখে ঝাপসা দেখে।

প্রভাব ঃ 'ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে হৃদরোগ, চক্ষু রোগ, পক্ষাঘাত, পায়ের পেশীতে খিল, মূত্র গ্রন্থীর প্রদাহ, চুলকানি, ফোঁড়া, পাঁচড়া, যক্ষ্মা, পায়োরিয়া ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত মহিলা ডায়াবেটিস রোগী মৃত সন্তানের জন্ম দান, অকালে সন্তান প্রসব, বেশি ওজনের শিশুর জন্ম দিয়ে থাকেন। অনেক সময় জন্মের পরই শিশুর মৃত্যু হয়। এছাড়াও শিশুর মধ্যে জন্মত্রুটি থাকতে পারে।

চিকিৎসা ঃ ডায়াবেটিস নিরাময় করা যায় না কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রোগ-নিয়ন্ত্রণে থাকলে স্বাভাবিক জীবন যাপনও করা যায়। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত ওষুধ ও ব্যায়াম এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। এছাড়াও শরীরের ওজন ও রক্ত চাপ স্বাভাবিক রাখলে ও ধূমপান না করলে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তেমন জটিলতা দেখা যায় না।

☒ বাতজ্বরের লক্ষণ কি? **(১১তম BCS)**

এটি এক ধরনের রোগ বা অল্প বয়স্কদের বেশী দেখা যায়। আক্রান্ত রোগীর ঘন-ঘন জ্বর হয়, খাওয়ায় অরুচি হয়। পায়ের হাটু সংলগ্ন জয়েন্ট ফুলে যায় এবং প্রদাহের সৃষ্টি হয়। হৃদপিন্ডে প্রদাহ হতে পারে।

Scanned by CamScanner

Teacher Work | রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা

- ❑ ডেঙ্গু
- ❑ হেপাটাইটিস
- ❑ ডায়াবেটিস
- ❑ জলাতঙ্ক
- ❑ বার্ড ফ্লু
- ❑ সোয়াইন ফ্লু
- ❑ প্লেগ
- ❑ Anthrax

Student Work | রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা

প্লেগ

কারণ ঃ ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে প্লেগ রোগটি হয়।

উৎপত্তি ঃ পঞ্চম শতাব্দীতে প্লেগের আক্রমণে বহু লোক মারা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে এ ভয়ংকর জীবাণুর আক্রমণে ইউরোপের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। তবে জীবাণু অস্ত্র হিসেবে এখনও কেউ এটা ব্যবহার করেনি। ১৯৭০ সালে এক পরিসংখ্যানে জাতিসংঘ দেখিয়েছে, বাতাসে ৫০ কিলোগ্রাম প্লেগ জীবাণু ছেড়ে দিলে ন্যূনতম দেড় লাখ লোক আক্রান্ত হবে এবং নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে ৩৬ হাজার মানুষ।

প্রতিক্রিয়া ঃ অ্যানথ্রাক্সের মত প্লেগও তিন ধরনের বিউবোনিক, নিউমোনিক ও সেপ্টসেমিক। ২ থেকে ১০ দিনের মধ্যে বিউবোনিক প্লেগের লক্ষণ পরিষ্কার হয়। প্রচণ্ড জ্বরের সাথে বিভিন্ন গ্রন্থিতে তীব্র ব্যথাও অনুভূত হয়। ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে নিউমোনিক প্লেগের লক্ষণগুলো ফুটে উঠে। কাশি, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বর হয়। এটা সহজেই একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। আক্রান্ত হওয়ার ২/৩ দিন পেরিয়ে গেলে কোন ওষুধই রোগিকে বাঁচাতে পারে না। সেপ্টেসেমিক প্লেগে উপরের দু'ধরণের লক্ষণগুলো দেখা দেয়।

প্রতিরোধ ঃ কিছু ঔষধ আছে। তবে প্লেগের ধরণ ও আক্রমণের কেন্দ্রস্থল খুব দ্রুত নির্ধারণ করতে না পারলে ঔষুধে কোন কাজ হয় না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza) এমন একটি রোগ যা সচরাচর ঘটে। বিভিন্ন ধরণের ভাইরাস (Virus)- এর আক্রমণে এই রোগের সৃষ্টি হয়। এটি প্রচণ্ডরকম সংক্রামক ব্যাধি এবং দ্রুত এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়। যখন একই এলাকায় বহু লোক এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন একে ইনফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিক (epidemic) বা মহামারী বলা হয়। তিন ধরণের ভাইরাসের আক্রমণে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সৃষ্টি হয়। এদের A, B এবং C গ্রুপের ভাইরাসের আক্রমণ ঘটলে এই রোগ ২ থেকে ৩ বৎসর অন্তর অন্তর আবার ঘটতে পারে। B গ্রুপের আক্রমণে ৪ থেকে ৫ বৎসর অন্তর অন্তর পুনরায় ঘটতে পারে। সকল বয়সের ব্যক্তিকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ আক্রমণ করতে পারে। শীতকালে এর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। কাশি ও সর্দি নিক্রমণের ফলে এই রোগ এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির শরীরে সংক্রমিত হয়। নাক এবং গলার ভিতর ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসগুলি তাদের বাসস্থান তৈরী করে। এর ফলে সর্দি, কাশি এবং গলদাহ এবং গলায় যন্ত্রণা হয়। তার ফলে জ্বর, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা এবং মাথা ধরা ঘটে। অনেক সময় রোগীর শরীরে ব্যথা হয়। সে খুব দুর্বল বোধ করে। প্রায় সবক্ষেত্রেই ইনফ্লুয়েঞ্জা তিনদিন থেকে এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। এই রোগের ফলে মৃত্যুর ঘটনা সাধারণতঃ কম এবং যারা মারা যায় তারা নিউমোনিয়া (pneumonia) প্রভৃতি অন্যান্য জটিলতার ফলে মারা যায়।

নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের রোগ যা সাধারণত মাইক্রো-অর্গ্যানিজম (micro-organism) বা সূক্ষ্ম জীবাণু থেকে জন্মায় যেমন, নিউমোকোক্কাস (pneumococcus) এবং মাইকোপ্লাজমা (mycoplasma)। রেডিয়েশনের (radiatiom) বা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গদ্বারা সঞ্চারিত শক্তির প্রভাবাধীন হওয়ার ফলে যেমন, এক্স-রে (X-ray) বা রঞ্জন রশ্মি- অথবা রাসায়নিক ধোঁয়া বা পাউডার নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করার ফলে নিউমোনিয়া হতে পারে। এই রোগের আক্রমণের ফলে ফুসফুসের থলিতে অস্বস্তিকর যন্ত্রণা হয়। এই অবস্থায় সংক্রামকতা প্রতিরোধ করার জন্য শরীর থেকে তরল পদার্থ এবং সাদা রক্তকোষ প্রবাহিত হয়। নিউমোনিয়ার লক্ষণের মধ্যে আছে শৈত্যানুভূতি, জ্বরের আক্রমণ, বুকে ব্যথা, কাশি এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টানুভব। রোগ সংক্রমণগ্রস্থ ব্যক্তি বার বার কাশতে কাশতে লোহার মরিচার মত রঙের ফ্লেম-মিউকাস উদগীরণ করেন। ফ্লেম-মিউকাসে যন্ত্রণাগ্রস্ত ফুসফুসের টিস্যুর রক্ত থাকে। এই লক্ষণ এক সপ্তাহ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত থাকে। তারপর শরীরের আত্মরক্ষামূলক যান্ত্রিক ব্যবস্থা রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু করে। এই রোগ দূরীকরণের উপায়ের মধ্যে আছে অ্যান্টিবাইওটিক ঔষধ নিউমোনিয়ার আক্রমণের ফলে মৃত্যুর ঘটনা হ্রাস করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

Scanned by CamScanner

মেনিনজাইটিস

মেনিনজাইটিস (meningitis) একটি মারাত্মক ব্যাধি। মেনিনজেস (meninges) নামীয় যে ঝিল্লী মস্তিস্ক এবং মেরুদণ্ডকে আবৃত করে রাখে তার প্রদাহের ফলে এই রোগ সৃষ্টি হয়। যদি এই রোগের সঠিক চিকিৎসা না হয় তাহলে মৃত্যু ঘটে। এই রোগ ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা করা দরকার। নিসেরিয়া মেনিনজাইটিডিস (Neisseria Meningitidis) নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের ফলে মেনিনজাইটিস রোগ হয়। ইহা মহামারীর আকারে বিস্তার লাভ করে। কতকগুলি গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে ১০ থেকে ১২ বৎসর অন্তর অন্তর এই রোগ বিস্তার লাভ করে এবং চার থেকে পাঁচ বৎসর স্থায়ী হয়। এই রোগ সাধারণতঃ শিশুদের আক্রমণ করে বিশেষভাবে যে সব শিশুর বয়স পাঁচ বৎসর থেকে কম। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই রোগ যে কোন ব্যক্তিকেই আক্রমণ করতে পারে। গ্রীষ্ম ঋতুতে এই রোগ খুব কম বিস্তার লাভ করে কিন্তু শীতের শেষে অথবা বসন্ত ঋতুতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। নোংরা পরিবেশে যে সমস্ত লোক বাস করে বিশেষ করে তাদেরই এই রোগ আক্রমণ করে।

আমাশয়

অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা নামক এক প্রকার প্রোটোজোয়ার আক্রমণে আমাদের অন্ত্রে আমাশয় রোগ হয়। আমাশয় হলে কোঁথানিসহ পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, পাতলা শ্লেষ্মা আমযুক্ত পায়খানা হয়। নাভির চারি দিকে ব্যথা, প্রসাবে কষ্ট, আমযুক্ত রক্ত, মুখলাল, আনাড়বাহ্য, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং মল ত্যাগের পর পুনরায় মলত্যাগ হবে বলে বসে থাকা, মলে দুর্গন্ধ, অনেক সময় জ্বর জ্বর ভাব থাকা এবং মল ত্যাগের পর ব্যথা কমে গিয়ে পুনরায় বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। আমাশয় রোগে দীর্ঘ দিন ভুগলে Liver Abscess অথবা Hepatitis রোগ হতে পারে।

অ্যামিবিক আমাশয়- প্রধানত এন্টামিবা নামক একপ্রকার এককোষী প্রাণী মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করলে এ ধরনের আমাশয় রোগ হয়।
ব্যাসিলারী আমাশয়- শিগেলা নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অন্ত্র আক্রান্ত হলে এ ধরনের আমাশয় হয়। জীবাণু বৃহদান্ত্রের ঝিল্লীকে আক্রমণ করে। ফলে বারবার পায়খানা হয় এবং পায়খানার সাথে শ্লেষ্মা বের হয়। অনেক সময় রক্তও যায়। এ জন্য এ রোগকে রক্তআমাশয় বলে। আমাশয় রোগ হলে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সাধারণত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

যক্ষ্মা

টিউবাকুলাস ব্যাসিলাস দ্বারা আক্রান্ত হলে যক্ষ্মারোগ হয়। এটিও একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, অপুষ্টিকর ও অপর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণ এবং অধিক পরিশ্রমে এ রোগ হয়। এই রোগে বিকালের দিকে সামান্য জ্বর, কাশি, কাশির সাথে রক্ত, ওজন কমা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। ডাক্তারের পরামর্শে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঔষধ সেবন ও বিশ্রাম নিলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক শিশুকে বি.সি.জি. টিকা দেওয়া উচিত। রোগীর কফের সাথে এই রোগ ছড়ায়।
ব্রঙ্কাইটিস- শ্বাসনালীর ভেতরে আবৃত ঝিল্লীর প্রদাহের কারণে এ রোগ হয়। ধূমপানেও এ রোগ হয়। জ্বর, খুসখুসে কাশি ও শ্বাসকষ্ট এ রোগের লক্ষণ।

কলেরা

ভিব্রিও কলেরি নামে পরিচিত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অন্ত্রে সংক্রমিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট রোগ। এ রোগের প্রধান উপসর্গ মারাত্মক ডায়রিয়া। এক হিসাবে দেখা যায় প্রতি বছর ডায়রিয়ার কারণে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এদের অধিকাংশই শিশু এবং এ সকল ডায়রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ কলেরা। উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে অবশ্য কলেরার মৃত্যুহার ১%- এরও কম। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আগে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অধিকাংশ রোগী মারা যেত। এখন পরিস্থিতি অনেক উন্নত হয়েছে। বিশেষত খাবার স্যালাইন বা লবণ-গুড়-পানির সরবত ডায়রিয়ার চিকিৎসায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, পরজীবীঘটিত সংক্রামক একটি রোগ। প্লাজমোডিয়াম প্রজাতির পরজীবিবাহক অ্যানোফিলিস জাতীয় মশার দংশনে মানুষের রক্তে উক্ত পরজীবির সংক্রমণ ঘটে। ফলে মানবদেহে ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দেয়। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগীর গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে এবং এক পর্যায়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। এক ধরনের ম্যালেরিয়ার ৪৮ ঘন্টা পরপর জ্বর আসে এবং আরেক ধরনের ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে জ্বর আসে ৭২ ঘন্টা পরপর। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মাথাধরা, পেশিতে ব্যথা, যকৃৎ ও প্লীহার আকার বৃদ্ধি, রক্তপাত ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। ম্যালরেয়িার চিকিৎসার জন্য কুইনাইন বা ক্লোরোকুইন, প্রিমাকুইন, এমোডিয়াকুইন, পাইরিমেথামাইল, ক্লোরোগুয়ানাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

Scanned by CamScanner

কালাজ্বর

কালাজ্বর প্রধানত উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকার রোগ লিশমেনিয়া ডনোভানি নামক পরজীবি এই রোগের কারণ। পরজীবিবাহী ফ্লেবোটোমাস জাতের মাছির দংশনে এই রোগ বিস্তারলাভ করে। কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীর মল, মূত্র এবং নাসিকায় নিঃসরণের মাধ্যমে সুস্থ শরীরে কালাজ্বরের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। কালাজ্বরে আক্রান্ত কুকুর, শেয়াল এবং অন্যান্য প্রাণীর কামড়েও মানবদেহে কালাজ্বরের বিস্তার ঘটতে দেখা যায়। এই রোগের প্রধান লক্ষণ জ্বর; সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান রক্তাল্পতা। তা ছাড়া এই রোগে রোগীর প্লীহা ও যকৃতের আকার বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসা না করানো হলে রক্তাল্পতা, ওজন হ্রাস ও অন্যান্য উপসর্গ রোগীর মৃত্যু ঘটে। কালাজ্বরের চিকিৎসায় সোডিয়াম স্টিবো-গ-ুকোনেট জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রথম কালাজ্বরের ঔষধ ইউরিয়া স্টিবামিন ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করেন।

মাথাব্যাথা

আমাদের শরীরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কের আবরণকে খুলি বলে। এই খুলিতে অসংখ্য শিরা এবং ধমনী থাকে। যেগুলি ব্যথায় সংবেদনশীল। তাছাড়া মস্তিষ্কের চতুর্দিকে অসংখ্য গ্রন্থি থাকে যেগুলি ব্যথায় সংবেদনশীল। কোনো কারণে ঐসব শিরা, ধমনী বা গ্রন্থি সকল আঘাত প্রাপ্ত হয় তখনই আমরা ব্যথা অনুভব করি। আমাদের মস্তিষ্কের শিরা এবং ধমনী গুলি বিভিন্ন কারণে আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে, যেমন চোখ, নাক, দাঁত প্রভৃতি আঘাত প্রাপ্ত হলে মস্তিষ্কের সংবেদনশীল শিরা এবং ধমনীগুলিও আক্রান্ত হয় ফলে আমাদের মাথা ধরে। মাথার কাছে কিংবা ঘাড়ের উপরকার দিকের মাংসপেশির সংকোচনের ফলেও মাথা ধরতে পারে। তাছাড়া পেটে গ্যাস হলেও অনেক সময় মাথা ধরতে দেখা যায়।

এ্যাজমা

এক প্রকার শ্বাস কষ্ট জনিত রোগ। পুরাতন কাশি বসে গেলে, রক্তে ইয়োসিনোফিল বৃদ্ধি পেলে, অজীর্ণ রোগ বা জন্মগত কারণেও এই রোগ হতে পারে। এই রোগে ক্রমাগত কাশি হতে থাকে ফলে রোগী এক সময় হাঁপিয়ে উঠে, রোগীর শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়। গলা সাঁই সাঁই করতে থাকে এবং বুকে চাপ সৃষ্টি হয়।

অম্ল

অম্ল বা অ্যাসিডিটি এক প্রকার অজীর্ণ রোগ। পাকস্থলি থেকে অধিক মাত্রায় পাক রস বের হওয়ার ফলে এই রোগ হয়। এই রোগের লক্ষণ হল মুখ দিয়ে উঠা কোষ্ঠকাঠিন্য, বুক জ্বালা, মাথা ধরা, পিপাসা পেটফুলে উঠা, মুখ দিয়ে অম্ল ঢেকুর, খাবারের আগে অথবা পরে গলা জ্বালা প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। দীর্ঘদিন যাবৎ এই রোগে ভুগলে আলসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জন্ডিস

রক্তের বাইল রঞ্জক নিঃসরণ হওয়া এবং মূত্র, চর্ম, শরীর হলদে যাওয়াকে পান্ডুরোগ বা জন্ডিস বলে। মদ্যপান, যকৃতের গন্ডগোল, অনিয়মিত খাদ্য গ্রহন, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পিত্তপাথরী প্রভৃতি কারনে জন্ডিস রোগ হয়। এই রোগ হলে রোগীর গায়ের চামড়া, চোখের সাদা অংশ, মূত্র প্রভৃতি হলুদ হয়ে যায়। এই সব ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময় পিত্তবমি, দুর্বলতা, অবসন্নতা, জ্বর জ্বর ভাব ক্ষিধে না পাওয়া মুখে তেতো স্বাদ, অরুচি, জামা কাপড়ে গায়ের ঘাম লেগে হলদে হয়ে যাওয়া প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। জন্ডিস থেকে লিভারে ফোঁড়া, লিভার সিরোসিস এমনকি ক্যান্সার রোগ পর্যন্ত হতে পারে।

স্কিজোফ্রেনিয়া

স্কিজোফ্রেনিয়া এক রকম মনোবিকার, যাতে রোগী এক সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতে বাস করতে আরম্ভ করে। তার কাছে বাস্তব জগতের চেয়েও ঐ জগত বেশি বাস্তব।

Scanned by CamScanner

আলসার

ত্বক বা কলার ক্ষতকে আলসার বলে। বিভিন্ন বয়সে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আলসার হতে পারে। অখাদ্য খেলে বা মৃদু সংক্রামণে মুখে ঘা হতে পারে। পায়ের চামড়া ফাটা ও রক্ত চলাচলের স্বল্পতাহেতু একধরনের আলসার হতে পারে। যেসব আলসার বহুদিন ধরেও সারতে চায় না সেগুলো বিপজ্জনক ক্যানসার জাতীয় হতে পারে। অনিয়মিত আহার বা অত্যাধিক মদ্যপান ইত্যাদির থেকে পাকস্থলী এবং যকৃতের আলসার হতে পারে।

বার্ড ফ্লু

আর্থোমিক্সিভাইরিডি গোত্রের এই ভাইরাস রোগের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ১৮৭৮ সালে। ১৯৫৫ সালে ইতালিতে আবার এই একই রোগ 'ফাউল প্লেগ' নামে পরিচিত হয়, যা আজকের 'বার্ড ফ্লু' বা 'অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা'। এটি খুব দ্রুত এক প্রাণীর দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে ছড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এই অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। এটি সার্স ভাইরাসের চেয়েও বিপজ্জনক। সার্স ভাইরাস মেলামেশার মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমিত হয়। অন্যদিকে বার্ড ফ্লু ভাইরাস কিন্তু সে রকম নয়। এই ভাইরাসটি দ্রুত রূপ বদল করতে সক্ষম হওয়ায় এটি চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা এই ভাইরাসটি চিনতে না পারলে এটি খুব সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যা বড় ধরনের বিপদ ও আতঙ্ক হয়ে দেখা দিতে পারে। অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব কিন্তু একদম নতুন নয়। এটি গত শতকের দিকেও দেখা দিয়েছিল। ১৯১৮ সালে স্পেনে এটি প্রথম দেখা দেয়। এই ভাইরাসের আক্রমণে সে সময় ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। অন্যদিকে এশিয়া মহাদেশে বর্তমানে H_5N_1 নামে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি হাঁস-মুরগিকে আক্রমণ করছে, মানব দেহে তার প্রথম চিহ্ন পাওয়া যায় ১৯৯৭ সালে হংকংয়ে। এশিয়াতে এই অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে যে এই নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

BCS প্রশ্নাবলী — হরমোন ও এনজাইম

☒ ইনসুলিন (Insulin) কি এবং এটি কি কাজে লাগে? **(৩৩, ২১ ও ১৫তম BCS)**

অগ্ন্যাশয়ের 'আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স' নামক গ্রন্থির বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত এক প্রকার হরমোন হচ্ছে ইনসুলিন। ইনসুলিনের প্রধান কাজ হচ্ছে রক্তে গ্লুকোজের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা। কোনো কারণে প্রয়োজনানুপাতে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে গ্লুকোজের বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয় ও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়। এ অবস্থায় মূত্রের সাথে গ্লুকোজ দেহ থেকে বের হয়ে যায়। ফলে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ সৃষ্টি হয়। ইনসুলিন উপরোক্ত কাজ ছাড়াও শ্বেতসার, আমিষ ও চর্বির বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

☒ ডায়াবেটিক ও ইনসুলিন-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। **(৩৩তম BCS)**

'ডায়াবেটিস' শব্দের মূল ভাবার্থ হল শরীর থেকে কোন পদার্থ অতিরিক্ত পরিমাণে বের হয়ে যাওয়া। এটি ইনসুলিনের সার্বিক কিংবা আপেক্ষিক অভাবের ফলে সৃষ্টি এমন এক রোগ যার ফলে গ্লুকোজ কোষে ঢুকতে পারে না; রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত গ্লুকোজ মূত্র দিয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, রক্তে শর্করা কমানোর জন্য মুখে খাওয়ার ঔষধ ও ইনসুলিন ব্যবহারে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অগ্ন্যাশয়ের আইলটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস-এর বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোনকে ইনসুলিন বলে। এটি একটি প্রোটিনজাতীয় হরমোন। এতে যথাক্রমে ২১টি ও ৩০টি অ্যামাইনো এসিড সম্বলিত দু'টি পেপটাইড শৃঙ্খল বিদ্যামান।

ইনসুলিনের অভাবে বা কম নিঃসরণের ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইনসুলিনের প্রধান কাজ রক্তে গ্লুকোজের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা। এটি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের বিপাকেও অংশ নেয়।

Scanned by CamScanner

☒ **হরমোন কি? মানবদেহে হরমোনের কাজ লিখুন।** **(৩১ ও ২৫তম BCS)**

হরমোন হলো অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নির্গত এক বিশেষ ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা সরাসরি রক্তে মিশে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে দেহের যাবতীয় জৈব কার্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। নিচে বিভিন্ন প্রকার হরমোনের কাজ বর্ণনা করা হলো ঃ

i. **গ্রোথ হরমোন ঃ** দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এর অভাবে মানুষ বেটে হয়।
ii. **থাইরক্সিন হরমোন ঃ** দেহের বিপাকে সহায়তা করে।
iii. **ইনসুলিন ঃ** রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় এবং শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে ডায়বেটিস রোগ হয়।
iv. **গ্লুকাগন ঃ** রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
v. **প্রোল্যাকটিন হরমোন ঃ** স্তন বর্ধনে এবং দুগ্ধ নিঃসরণে সহায়তা করে।
vi. **অ্যাড্রেনালিন হরমোন ঃ** জরুরি বিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। বিপদ মোকাবিলায় সহায়তা করে।
vii. **টেস্টোস্টেরন ঃ** পুরুষের আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে এবং শুক্রাণু উৎপাদন করে।
viii. **ইস্ট্রোজেন ও প্রজোস্টেরন ঃ** স্ত্রীলোকের আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সাহায়তা করে এবং অমরা গঠনে সহায়তা করে।
ix. **রিলাক্সিন ঃ** স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় শ্রোণীবন্ধনী শিথিল করে।

☒ **পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত এনজাইমগুলো কি কি?** **(২৪তম BCS)**

পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত এনজাইমগুলো হলো পেপসিন, রেনিন, অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন ইত্যাদি।

☒ **পাস্তরিত দুধ কি? এতে দুধের গুণাগুনের কি কোন পরিবর্তন হয়?**

পাস্তরায়ন অর্থ আংশিক নির্জীব। বিশেষ করে দুধকে জীবাণুমুক্ত করা বা পরিশোধন কে পাস্তরায়ন বলে। দুধকে ৩০ মিনিট ধরে ১৪৫°-১৫০° ফা. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে হঠাৎ ৫০° ফা. তাপমাত্রায় নামিয়ে আনলে দুধ জীবাণুমুক্ত হয়। এমতাবস্থায় দুধকে ৫০° ফা. তাপমাত্রার নীচে রাখলে কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত জীবাণুমুক্ত থাকে। এই পদ্ধতির আবিস্কারক বিজ্ঞানী লুইপাস্তর।

পাস্তরিত দুধের অধিকাংশ ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়ার পাস্তরণ প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়। এই কারণে টাটকা তরল দুধের মতো পাস্তরিত দুধে ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়না। পাস্তরণ পদ্ধতিতে দুধের ভিটামিন এ ও রাইবোফ্লো-ভিনের ক্ষতি হয় না। তবে প্রায় এক পঞ্চমাংশ থায়ামিন এবং প্রায় ২০% এসকরবিক এসিড নষ্ট হয়, খনিজ পদার্থের পরিমাণে কোন পরিবর্তন হয় না।

☒ **দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয় কেন?**

খাদ্যের ছয়টি উপাদানই দুধে পরিমিত মাত্রায় থাকে বলে দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়। যেমন–

(i) শর্করা হিসেবে দুধে আছে ল্যাকটোজ।
(ii) আমিষ হিসাবে আছে কেজিন ও অ্যালবুমিন।
(iii) স্নেহ হিসাবে আছে ছোট ছোট দানাদার পদার্থ।
(iv) খনিজ হিসাবে আছে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস।
(v) পানি হলো দুধে অন্যতম উপাদান।
(vi) ভিটামিনের মধ্যে ভিটামিন সি ছাড়া সব ভিটামিন দুধে বিদ্যামান।

Scanned by CamScanner

BCS প্রশ্নাবলী

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

☒ Vaccine কি? ভ্যাক্সিন (Vaccine)-এর প্রয়োগ লিখুন। **(৩৩তম BCS)**

ভ্যাক্সিন শব্দের অর্থ প্রতিরোধক। অর্থাৎ ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে পূর্ব থেকেই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। নির্দিষ্ট ভ্যাক্সিন নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে।

প্রয়োগ : কিছু কিছু ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা শরীর একবার সংক্রমিত হলে শরীর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায়। সেই অ্যান্টিবডি পরবর্তীতে ঐ রোগের সংক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে। ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রোগের জীবাণু সরাসরি অথবা বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে এমন মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করানো হয় যাতে সেটি রোগ সৃষ্টি না করে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে। সেই অ্যান্টিবডিই পরবর্তীতে ঐ রোগ থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

☒ Vaccination বলিতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে মানবদেহের জন্য প্রচলিত Vaccine গুলি কি কি ? **(৩০তম BCS)**

ভ্যাক্সিন অর্থ প্রতিরোধক। ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। ভ্যাক্সিন ব্যবহারের মাধ্যমে মানব শরীরের জন্য ভয়াবহ কয়েকটি রোগ প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণই ভ্যাক্সিনেশন।

রোগ প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশে মানুষের দেহে যেসব ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হল-

রোগ	ভ্যাক্সিন	রোগ	ভ্যাক্সিন
যক্ষা	বিসিজি	ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, হুপিংকাশি	ডিপিটি
পোলিও	ওপিভি	টাইফয়েড	টিএবিসি
হাম	এমএমআর	জলাতঙ্ক	র‍্যাবিস
হেপাটাইটিস	হেপাটাইটিস ভ্যাক্সিন		

☒ Antibiotic ও Antiseptic কি? উদাহরণ দিন। **(৩৫, ৩০, ২৮তম BCS)**

এন্টিসেপটিক (Antibiotic) ঃ যে সব বস্তু জীবাণুর বিস্তার ও বৃদ্ধি সীমিত করে অসংক্রামক অবস্থায় রাখে তাদের এন্টিসেপটিক বলে।

এন্টিবায়োটিক (Antiseptic) ঃ এন্টিবায়োটিক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা অণুজীব থেকে বা রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং যা পোষকের দেহের ক্ষতি না করে জীবাণু ধ্বংস বা বংশবৃদ্ধি ব্যাহত করে।

এন্টিবায়োটিক ও এন্টিসেপটিকের মধ্যে পার্থক্য ঃ

এন্টিসেপটিক	এন্টিবায়োটিক
১। এন্টিসেপটিক হলো জীবাণু প্রতিরোধক।	১। এন্টিবায়োটিক হল জীবাণু প্রতিষেধক।
২। এটি পানির সাথে মিশিয়ে বা স্প্রে করে ব্যবহার করা হয়।	২। এটি ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৩। এটি প্রাণীদেহের বাইরের আবরণে ছাড়া প্রাণীর ব্যবহার্য সামগ্রীতেও ব্যবহার করা হয়।	৩। এটি প্রাণীদেহের অভ্যন্তরে ব্যবহার করা হয়।
৪। সংক্রমণ না হওয়া সত্ত্বেও জীবাণু প্রতিরোধের জন্য এটি প্রয়োগ করা যায়।	৪। সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর জীবাণু ধ্বংসের জন্য এটি প্রয়োগ করা হয়।
৫। উদাহরণ ঃ ডেটল, স্যাভলন ইত্যাদি।	৫। উদাহরণঃ পেনিসিলিন, এমপিসিলিন ইত্যাদি ।

Scanned by CamScanner

☒ রোগ নিরূপণে EEG, ECG এবং CT Scan- এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন। **(২৯ ও ২০তম BCS)**

EEG (ইইজি) ঃ EEG- এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Electroencephalography। মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যক্রম পরীক্ষার একটি পদ্ধতি হচ্ছে EEG। এ পদ্ধতিতে ঘাড় ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় তড়িৎদ্বার স্থাপনের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যক্রমকে গ্রাফ আকারে রেকর্ড করা হয়। মৃগী, স্ট্রোক প্রভৃতি রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসায় EEG ব্যবহৃত হয়।

ECG (ইসিজি) ঃ ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফি (Electrocardiography) সংক্ষেপে ই. সি. জি হল হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের ফলে সৃষ্ট বিদ্যুৎ-কম্পনের রেখাচিত্র অঙ্কনের একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা। এইভাবে গৃহীত রেখাচিত্রকে বলা হয় ইলেট্রোকার্ডিওগ্রাম (E.C.G.)। হৃদযন্ত্রের সমস্ত প্রকারের কাজ কর্মই বিদ্যুৎ কম্পনের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ভালভ, যেগুলি থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, সেগুলি সহ হৃদযন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গই নিজ নিজ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্যাটার্ণ (বিন্যাস) সৃষ্টি করে। এই বিদ্যুৎ স্পন্দনের পৃথক পৃথক রেখাকে চিহ্নতকরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই বলা হয় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফি।এ পদ্ধতিতে দেহের বিভিন্ন জায়গায় বারটি তড়িৎদ্বার স্থাপনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রমকে গ্রাফ আকারে রেকর্ড করা হয়। বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় ECG ব্যবহৃত হয়।

CT Scan (সিটি স্ক্যান) ঃ এক্স-রে ব্যবহারের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনো অঙ্গের ত্রিমাত্রিক ইমেজ বা ছবি তৈরি করার পদ্ধতিকে সিটি স্ক্যান বলা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রথমে এক্স-রে ব্যবহার করে দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনো অঙ্গের অনেকগুলো দ্বিমাত্রিক ছবি তোলা হয়। পরবর্তীতে এ দ্বিমাত্রিক ছবিগুলোকে একত্রিত করে কম্পিউটারের সাহায্যে অঙ্গটির ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করা হয়। মস্তিক, যকৃত, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক এবং দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনগত অস্বাভাবিকতা ও রোগ নির্ণয়ে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।

☒ Antigen, Antibody ও Immunity কি? **(২৮তম BCS)**

অ্যান্টিবডি রক্তে উৎপন্ন প্রতিরোধক পদার্থবিশেষ। দেহে যখন কোনো রোগজীবাণু, ভাইরাস প্রভৃতি প্রবেশ করে, তখন তাদের প্রতিহত করার জন্য শ্বেত কণিকা থেকে এক প্রকার প্রোটিনজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। একে অ্যান্টিবডি বলে। অ্যান্টিবডি যেসব প্রোটিন কণাকে ধ্বংস করে বা যে প্রোটিনের প্রবেশের ফলে দেহে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বলে। অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে দেহে প্রবিষ্ট রোগজীবাণু বা অ্যান্টিজেনকে প্রতিহত করার ক্ষমতাকে ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা বলে।

☒ ভ্যাক্সিন কি? গুটি বসন্তের টিকা কিভাবে তৈরি হয়? **(২৭তম BCS)**

ভ্যাক্সিন ঃ আমাদের দেহের জীবাণুঘটিত প্রত্যেকটি রোগ একেকটি নির্দিষ্ট জীবাণু দ্বারা সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। কোনো একটি রোগের জন্য দায়ী নির্দিষ্ট জীবাণুগুলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে এমন মাত্রায় দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয় যেন উক্ত জীবাণুগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে না পারে। এ দুর্বল ও প্রক্রিয়াজাত জীবাণুগুলোকে যখন আমাদের রক্তে তথা শরীরে প্রবেশ করানো হয় তখন এটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জাগ্রত করে তোলে কিন্তু কোনো রোগ সৃষ্টি করে না। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জাগ্রত হওয়ার কারণে উক্ত জীবাণুর বিরুদ্ধে এক ধরনের শক্তিশালী এন্টিবাডি তৈরি হয় যা উক্ত জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। পরবর্তীতে উক্ত রোগের কোনো সক্রিয় জীবাণু যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তখন পূর্বে সৃষ্ট ঐ এন্টিবডিগুলো রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে। ফলে কোনো রোগ সৃষ্টি হয় না। এভাবে কোনো রোগের জন্য দায়ী জীবাণুগুলোকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে উক্ত রোগের বিরুদ্ধে আমাদের দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাকেই ভ্যাক্সিন বলা হয়।

গুটি বসন্তের টিকা তৈরির প্রক্রিয়া ঃ গুটি বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত কোনো প্রাণীর দেহ থেকে প্রথমে গুটি বসন্তের জন্য দায়ী নির্দিষ্ট প্রজাতির ভাইরাস সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে সংগৃহীত এই নির্দিষ্ট প্রজাতির ভাইরাসকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে গুটি বসন্তের টিকা তৈরি করা হয়।

☒ ডিজইনফেক্ট্যান্ট এবং এ্যান্টিসেপটিক-এর মধ্যে প্রভেদ কি এবং এদের প্রয়োগস্থান কোথায়? **(২৭তম BCS)**

ডিজইনফেক্ট্যান্ট (Disinfectant) ও অ্যান্টিসেপটিকের (Antiseptic) মধ্যকার পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

i. ডিইনফেক্ট্যান্ট দ্বারা কোনো বস্তুকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এর দ্বারা জীবাণু ধ্বংসের হার শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ।
অপরদিকে, অ্যান্টিসেপটিক দেহে জীবাণু সংক্রমণের (infection) সম্ভাবনা বহুলাংশে কমিয়ে দেয় কিন্তু দেহকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করতে পারে না।

ii. ডিজইনফেক্ট্যান্ট শরীরের জীবন্ত কোষ ও টিস্যুতে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ এটি জীবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর।
কিন্তু অ্যান্টিসেপটিক তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর হওয়ায় এটি শরীরের যে কোনো অংশে প্রয়োগ করা যায়।

iii. আয়োডিন দ্রবণ, তুঁতে, ওজোন ও ক্লোরিন গ্যাস ইত্যাদি হলো ডিজইনফেক্ট্যান্ট-এর উদাহরণ।
অপরদিকে, ৭০% ইথানল দ্রবণ, ৩% হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণ ইত্যাদি হলো অ্যান্টিসেপটিকের উদাহরণ।

Scanned by CamScanner

প্রয়োগস্থান ঃ

ডিজইনফেক্ট্যান্ট ঃ যে কোনো প্রাণহীন বস্তুতে প্রয়োগ করা হয়।

অ্যান্টিসেপটিক ঃ মানবদেহের ত্বকে অথবা যে কোনো প্রাণীদেহের ত্বকে প্রয়োগ করা যায়।

(১৫তম BCS)

☒ **পেনিসিলিন কি এবং কে আবিষ্কার করেন?**

পেনিসিলিন একটি এন্টিবায়োটিক ঔষধ। এটি সাধারণত Penicillium notatum বা Penicillium chrysogenum নামক ছত্রাক থেকে উৎপাদন করা হয়। স্কটিশ জীবাণুবিদ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৯ সালে এটা আবিস্কার করেন।

Teacher Work — রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

❑ এন্টিসেপটিক ❑ এন্টিবায়োটিক ❑ পেনিসিলিন ❑ প্লাস্টিক সার্জারি ❑ আলট্রাসনোগ্রাফি

Student Work — রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

☒ **টিকা (Vaccine) কি?**

টিকা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ধরণের রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণু। এগুলো কোন প্রাণীর দেহে নির্দিষ্ট পরিমাণে ঢুকিয়ে দিলে তা দেহের মধ্যে বিশিষ্ট রোগের প্রতিরোধকারী, প্রোটিন (এন্টিবডি) সৃষ্টি হয়, যা ঐ রোগের আক্রমন থেকে দেহকে রক্ষা করে। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস, ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন রোগের টিকা তৈরি করা হয়। হাম, পোলিও, যক্ষা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের টিকা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

☒ **EPI কি?**

EPI এর পূর্ণরূপ Expanded Programme On Immunization. ভ্যাক্সিন প্রয়োগের মাধ্যমে এটি মারাত্মক রোগ থেকে বিশ্বের সকল শিশুকে রক্ষার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশ্বব্যাপী এই কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এই ৬টি রোগ হলো – ডিপথেরিয়া, হাম, হুপিংকাশি, ধনুস্টংকার, পোলিও ও যক্ষা।

☒ **শিশুদের মারাত্মক রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য কখন টিকা দিতে হয়?**

শিশুদের মোট ৬টি মারাত্মক রোগের টিকা জন্মের পর এক বছরের মধ্যে দিতে হয়।

রোগের নাম	টিকার নাম	সময়
ডিপথেরিয়া	ডিপিটি টিকা	জন্মের দেড়মাস থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে
হুপিং কাশি	ডিপিটি টিকা	এক মাস অন্তর অন্তর মোট তিনটি ডোজ
ধুনস্টংকার		
পোলিও	ওরাল পোলিও ভ্যাক্সিন (OPV)	জন্মের পর দেড় মাস থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে এক মাস অন্তর অন্তর তিন বার খাওয়াতে হবে।
হাম	এমএমআর	৯ মাস পূর্ণ হলে এক ডোজ
যক্ষা	বিসিজি	জন্মের পর ১ বছরের মধ্যে যে কোন সময় এই টিকা দিতে হয়।

Scanned by CamScanner

☒ X-ray কি? চিকিৎসা বিজ্ঞানে X-ray- এর গুরুত্ব কি?

এক্স-রে (X-ray): দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতব পদার্থের উপর পতিত হলে ধাতব পদার্থ হতে উচ্চ ভেদন ক্ষমা সম্পন্ন যে বিকিরণ নির্গত হয় তাই এক্স-রে-বা রঞ্জন রশ্মি। ১৮৯৫ সালে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী উইলিয়াম রন্টজেন এক্স-রে আবিস্কার করেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে X-ray- এর গুরুত: আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রে-এর ব্যবহার রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রে-এর গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. দাঁতের গোড়ায় ঘা, হাড় ভাঙার সমস্যা নির্ণয়ে ও অস্ত্রোপচারের পূর্বে ও পরে এক্স-রে-এর ব্যবহার অপরিহার্য।
২. শরীরের কোনো অংশের হাড় স্থানচ্যুত হলে, হাড় ভেঙে গেলে বা শরীরের কোনো অংশে অবাঞ্ছিত কোনো বস্তু প্রবেশ করলে এক্সরে-এর দ্বারা তা নির্ণয় করা যায়।
৩. আলসার, ক্যান্সার, টিউমার, যক্ষ্মা, কিডনির পাথর প্রভৃতি রোগ নির্ণয় এবং রোগের সঠিক চিকিৎসায় এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।

☒ এমআরআই (MRI) কি? এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

এমআরাই : এমআরআই ইংরেজী Magnetic Resonance Imagine-এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটি ব্যথাহীন এবং নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। এ যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের কোনো স্থানের বা অঙ্গের বিস্তৃত প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়।

MRI-এর কার্যপ্রণালী : এই যন্ত্রে এক্সরে বা অন্য কোনো ধরনের বিকিরণ ব্যবহার করা হয় না। শরীরে যে অংশের এমআরআই স্ক্যান করা হয় সেখান থেকে প্রাপ্ত সংকেতকে একটি কম্পিউটারের সাহায্যে পরিবর্তিত করে সেই অংশের অত্যন্ত স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি প্রতিবিম্ব শরীরের কোনো স্থানের এক একটি ফালি বা স্লাইসের মতো কাজ করে। এভাবে অনেকগুলো প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়, যেগুলো শরীরের ঐ অংশের সকল বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে MRI এর ব্যবহার লিখুন।
এমআরআই হলো ব্যথাহীন এক নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। নিম্নে এর ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-
পায়ের গোড়ালির মচকানো এবং পিঠের ব্যথায় এমআরআই ব্যবহার করে জখমের বা আঘাতের তীব্রতা নিরূপণ করা হয়।
ব্রেন এবং মেরু রুজ্জুর (spinal card) বিস্তৃতি প্রতিবিম্ব তৈরির জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

☒ এনডোসকপি (Endoscopy) কি? কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন।

অপটিক্যাল ফাইবার সাহায্যে শরীরের ভেতরে আলোক উৎস প্রবেশ করিয়ে গ্যাস্ট্রো ইনটেষ্টিনাল ট্র্যাক্টে সরাসরি পর্যবেক্ষণকে এনডোসকপি বলে। ফাইব্রোটিক এডোসকপি ব্যবহারের মাধ্যমে আলোক উৎসের অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে পাকস্থলীর ঘা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এক্স-রে রিপোর্ট সন্দেহজনক হলে গ্যাষ্ট্রিক আলসার, পেপটিক আলসার, ডিউডেনাম আলসার, ক্যান্সার কোষ, অবাঞ্ছিত বস্তু অপসারণের পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এনডোসকপি করা হয়।

Endoscopy কার্যপ্রণালী : এনডোসকপি যন্ত্রে দুটি নল থাকে, এদের একটির মধ্যে দিয়ে বাইরে থেকে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গে আলো প্রেরণ করা হয়। আলোক তন্তুর ভেতরের দেয়ালে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে উজ্জ্বল আলো রোগীর দেহ গহ্বরে প্রবেশ করে। এ আলো রোগাক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গকে আলোকিত করে। দ্বিতীয় আলোক তন্তু নলের ভেতর দিয়ে আলোর প্রতিফলিত অংশ একইভাবে ফিরে আসে। প্রতিফলিত আলো অভিনেত্র লেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসকের চোখে প্রবেশ করে। ফলে চিকিৎসক পরীক্ষণীয় অঙ্গের অভ্যন্তরে কী ঘটছে বা হচ্ছে তা দেখতে পারেন।

অ্যান্টিবায়োটিক

শরীরে বিভিন্ন ইনফেকশনের চিকিৎসার জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করা হবে তা হলো অ্যান্টিবায়োটিক। ইনফেকশন সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং অন্যান্য আরো কিছু জীবানু দিয়ে হয়ে থাকে। অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের জীবাণু থেকে এ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুত করা হয়। যেমনঃ পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিন, টেপটোমাইসিন প্রভৃতি এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং সর্বপ্রথম পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন। এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে জীবাণুর কোষ প্রাচীর গঠিত হয় না। তাই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার জীবাণু দেহে পর্যন্ত পানির অণু প্রবেশ ঘটে এবং জীবাণুর দেহে ভেঙ্গে যায়। এইভাবে এন্টিবায়োটিক জীবাণুকে ধ্বংস করে।

উৎস ঃ ক. প্রাকৃতিক- সাধারণত অন্য কোন ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক কিংবা গাছপালা থেকে সংগ্রহ করা হয়। যেমন- পেনিসিলিন।
খ. কৃত্রিম- রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তৈরি করা হয়।

Scanned by CamScanner

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ঃ অ্যান্টিবায়োটিক মানব কল্যান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে আশীবাদ স্বরুপ। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার সতর্কতার অভাবে নির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঐ ঔষধ আর সেই রোগে কাজ করে না।

কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ ১. যে কোন ভাইরাস জনিত রোগের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ভুল ব্যবহার।
২. যদি প্রয়োগের মাত্রা কম হয় অথবা প্রয়োজনের চেয়ে কম সময় ব্যবহার করা হয়।
৩. যদি অপ্রয়োজনে বেশি ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশে সাধারণত জ্ঞানের অভাবে রোগী সামান্য প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করে এবং রোগের লক্ষণ কমে যাবার পর ঔষধ বন্ধ করে দেয়। এতে করে অনেক চমৎকার অ্যান্টিবায়োটিক এখন আর আমাদের দেশে কাজ করছে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঃ ১. সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে দেখা যায় অনেকের ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। এছাড়া বমি ভাব বা বমি হতে পারে।
২. বেশি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে রোগীর অন্য জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
৩. অনেকের নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক এলার্জি থাকে। তাদের ক্ষেত্রে শরীর ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, চুলকানি, জ্বর, শরীরে চাকা চাকা দাগ এসব হতে পারে। একবার এরকম হলে পরবর্তীতে আর সেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত নয়।

পরার্স্টিক সার্জারি

প্লাস্টিক সার্জারী এক ধরণের শল্য-চিকিৎসার। এই চিকিৎসার ফলে জন্মগত বা কোনো দুর্ঘটনায় বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাইরের চেহারা শোধরাতে পারা যায়। মুখে বসন্তের দাগ বা অন্য কোথাও কাটা, পোড়া, এইসব খুঁত স্বচ্ছন্দে প্লাস্টিক সার্জারী করে দূর করতে পারা যায়।

দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যে প্লাস্টিক সার্জারী করা হয় তাকে প্রসাধনিক শল্য চিকিৎসা (cosmetic surgery অথবা beauty surgery) বলা হয়। মুখে বসন্তের দাগ বা কোচকানো চামড়া এ সবই দূর করা যেতে পারে। মেয়েরা ইচ্ছে মতো তাঁদের বুকের আকার শুধরে নিতে পারেন। চোখের পাতা, ঠোঁট, নাক সব কিছুই প্লাস্টিক সার্জারীর সাহায্যে মেরামত করে ফেলা যায়।

যে জায়গাটা মেরামত করার দরকার ঠিক সেই আকারের চামড়া শরীরের অন্য এক জায়গায় থেকে কেটে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়। এর জন্য দু স্তরের মাত্র চামড়া নেওয়া হয় যাতে করে তাদের কোষ চটপট বেড়ে উঠে আক্রান্ত জায়াগাটা বেমালুম সারিয়ে তুলতে পারে।

আকুপাংচার

আকুপাংচার রোগের এক রকম চিকিৎসা। Acus ও Puncture শব্দ দুটি থেকে আকুপাংচার (Acupuncture) কথাটি এসেছে। Acus শব্দের অর্থ সুই এবং Puncture শব্দের অর্থ ফোটানো। সুতরাং আকুপাংচার (Acupuncture) শব্দের আক্ষরিক অর্থ সুই ফুটানো। রোগ নিরাময়ে স্টেইনলেস স্টিলের সুইয়ের প্রয়োগ প্রণালীই হল আকুপাংচার। আকুপাংচার বা সুই ফুটিয়ে রোগের চিকিৎসা চীনের মানুষের হাজার হাজার বছরের গবেষণার ফল। তবে প্রাচীন ভারত বর্ষেও এরকম ধরনের চিকিৎসার প্রচলন ছিল বলে ধারণা করা হয়। আমাদের দেশে কোন ক্ষতে লোহা পুড়ে লাগিয়ে দেয়া, কবিরাজের 'গুল' দেয়া, সুই গরম করে কান ফুটো করা। উল্কি দেয়া সম্ভবত আকুপাংচারেরই আদিম রূপ। তবে আধুনিক আকুপাংচার চিকিৎসার রূপকার হল চীন। চীনরাই হাজার হাজার বছর সাধনা করে এই আকুপাংচার পদ্ধতিকে বিকশিত করেছেন এবং পরিণত করেছেন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে। এই চিকিৎসায় প্রথমে পাথরের সুই, এর পর বাঁশের সুই ব্যবহৃত হত। বর্তমানে স্টেইনলেস স্টিলের সুই ব্যবহার করা হয়। চীনের মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেন যে, মানুষের দেহের বিশেষ কতগুলো জায়াগায় সুই ফুটালে বিভিন্ন কষ্টের লাঘব হয়। এগুলো হল ফুসফুস, বৃহদন্ত্র, পাকস্থলী, প্লীহা, হৃদপিন্ড, ক্ষুদ্রান্ত্র, মূত্রথলি কিডনী বা বৃক্ক, পিত্তথলি ও যকৃত।

আলট্রাসনোগ্রাফি

আলট্রাসনোগ্রাফি হল ব্যথাহীন এমন একটি টেকনিক যা শব্দ ও তার প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে অন্তঃস্থ অঙ্গকে পর্যবেক্ষণ করে ও তার অবস্থান নির্ণয় করে। শরীরের যে অংশ পরীক্ষা করা হবে তার উপর প্রথমে খনিজ তেলের মতো পিচ্ছিল কারক মাখা হয়। তারপর শব্দ তরঙ্গ নিঃসরণ করে এবং প্রতিধ্বনি গ্রহণ করে এমন একটি মাইক্রোসকোপ জাতীয় মেশিন শরীরের চামড়ার উপর দিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়। একটি অসমিনোসকোপ বা কমপিউটার শব্দ তরঙ্গকে ছবিতে রূপান্তরিত করে যা টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়। কিডনি ও অ্যাবডোমেনের রোগ নির্ণয়ে এটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে তা জানার কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়।

Scanned by CamScanner

☒ **মানবদেহে কিডনীর কাজ কি?** **(৩৩তম BCS)**

মানবেদেহে কিডনীর কাজ :

১. রক্ত হতে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে।
২. দেহে পানির স্থিতাবস্থা বজায় রাখে এবং রক্ত ও রক্তরসের পরিমাণ বজায় রাখে।
৩. অঅম্লক্ষারের সমতা রক্ষা করে।
৪. বিভিন্ন প্রতিবিষ ও ঔষধ দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত করে।
৫. রক্তের চাপ ও আয়তন ঠিক রাখে।

☒ **অতি পরিচিত পাঁচটি পানিবাহিত রোগের নাম লিখুন?** **(৩৩তম BCS)**

পানির মাধ্যম যেসব রোগের সংক্রমণ ঘটে সেগুলো পানিবাহিত রোগ। আমাদের অতিপরিচিত পাঁচটি পানিবাহিত রোগ হল : কলেরা, টাইপয়েড, ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস।

☒ **'Test-tube' শিশু কি?** **(২৩তম BCS)**

নারী গর্ভের বাইরে পুরুষের শুক্রাণুর সাথে নারীর ডিম্বানুর মিলন ঘটানো বা নিষিক্ত করে ঐ ভ্রুণকে উপযুক্ত যত্ন ও সুরক্ষার মাধ্যমে মানব শিশুতে পরিণত করা হলে, সেই বর্ধিত শিশুকে বলা হয় টেস্টটিউব শিশু। উক্ত প্রক্রিয়ায় টেস্টটিউবটি কাজ করে নারীগর্ভের ফ্যালোপিয়ান টিউবের মত। নিষিক্ত করার পর মাতৃগর্ভে ভ্রণটি প্রবিষ্ট করানো হয়। নয় মাস ধরে মাতৃগর্ভের ঐ ভ্রুণ বড় হওয়ার পর পরিপুষ্ট মানব শিশু জন্ম গ্রহণ করে। ১৯৭৮ সালে মিসেস ব্রাউন নাম্নী এক ভদ্রমহিলা পৃথিবীর সর্ব প্রথম টেস্টটিউব শিশুটি প্রসব করেন। শিশুটি ছিল মেয়ে। তার নাম লুইস ব্রাউন। পদ্ধতিটির নিখুঁত প্রয়োগিক কৃতিত্বের অধিকারী হলেন ডঃ প্যাট্রিক স্টেপটো এবং রবার্ট এডওয়ার্ড।

☒ **মানবদেহে শিরার মধ্যে বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করানো বিপজ্জনক কেন?** **(২৩তম BCS)**

মানবদেহের শিরার মধ্যে থাকে রক্ত, যার ঘনত্ব বিশুদ্ধ পানির ঘনত্বের চেয়ে বেশি। শিরার মধ্যে বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করালে রক্তের ঘনত্ব কমে যায়। ফলে কোষে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং পানি প্রবেশের ফলে কোষ নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য মানবদেহের শিরায় বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করানো উচিত নয়।

☒ **মানবদেহে কিডনীর কাজ কি?** **(২৩তম BCS)**

কিডনি মানবদেহে রক্তের ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে থাকে। কিডনি রক্ত থেকে দেহের প্রয়োজনীয় উপাদান রেখে দূষিত ও অপ্রয়োজনীয় অংশ প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেয়। সাধারণ প্রস্রাবে দেহের ক্ষতিকর পদার্থ ইউরিন হিসেবে বের করে।

☒ **পেটে গ্যাস হলে কার্বন ট্যাবলেট সেবন করতে বলা হয় কেন?** **(২৩তম BCS)**

পেটে গ্যাস হলে যদি কার্বন ট্যাবলেট সেবন করা হয় তাহলে ট্যাবলেট গ্যাসকে পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইডে রূপান্তরিত করে। নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বের হয়ে যায় বলে রোগী আরাম বোধ করে।

☒ **পাকস্থলীতে যে এসিড হয় এটি কি?** **(২১তম BCS)**

পাকস্থলীতে যে এসিড হয় তা হলো হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCI)। হাইড্রোক্লোরিক এসিড পাকস্থলীতে উপস্থিত থেকে নিষ্ক্রিয় পোসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড শর্করা পরিপাকে সাহায্য করে।

Scanned by CamScanner

(১৩তম BCS)

☒ জীব বিবর্তনে মানুষ যে প্রজাতি তার নাম কি? এ নামের অর্থ কি?

মানুষ প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম হোমো সেপিয়েন্স। এ নামের মাধ্যমে মানুষকে একটি বিশেষ এবং সবপ্রজাতি থেকে আলাদা প্রজাতি হিসেবে বোঝানো হয়েছে।

(১১তম BCS)

☒ চোখের ছানি অপারেশনে কি করা হয়?

চোখে ছানি পড়া হল চক্ষুলেন্স ঘোলাটে হয়ে যাওয়া এটি ডায়াবেটিস, কোন আঘাত বা সংক্রমনের দ্বারা হতে পারে, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছানি পড়ার সম্ভবনা বাড়তে পারে। চোখে অস্ত্রোপচার করে রোগক্রান্ত লেন্সকে কনট্রাক্ট লেন্স দ্বারা প্রতিস্থাপন করে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসা না করলে এক সময় চোখ ফুলে গিয়ে চক্ষু গোলক নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

☒ স্বাস্থ্য কি? বাংলাদেশে স্বাস্থ্য পরিচর্যার পর্যায় গুলো কি কি?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দেওয়া সংজ্ঞানুসারে "স্বাস্থ্য হচ্ছে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিকভাবে সম্পূর্ণ ভালো থাকা কেবল রোগ বা অক্ষমতা থেকে মুক্তি নয়।"

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য পরিচর্যার পর্যায় গুলো হলো ঃ

(i) **প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ** ইউনিয়ন সাব সেন্টর ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র।
(ii) **মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ** জেলা হাসপাতাল সমূহ।
(iii) **চূড়ান্ত বা টারসিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ** মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সমূহ, বিশেষায়িত হাসপাতাল সমূহ।

☒ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কি? প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার বিষয় সমূহ কি কি?

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO এর মতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা যা বিজ্ঞানসম্মত ও সামাজিক ভাবে গৃহিত, যা ব্যক্তি এবং পরিবারের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হতে পারে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার বিষয় সমূহ ঃ

i) রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা।
ii) খাদ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন।
iii) পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।
iv) পরিবার পরিকল্পনাসহ মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা
v) সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ টিকা প্রদান।
vi) সাধারণ রোগগুলোর সঠিক চিকিৎসা।
vii) প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করা।

☒ ছোঁয়াচে রোগ ও সংক্রামক রোগ কাকে বলে?

ছোঁয়াচে রোগ ঃ রোগীর সংস্পর্শে এলে যে সব রোগ আক্রমণ করে তাদের কে ছোঁয়াচে রোগ বলে।
যেমন : যক্ষ্মা, চর্ম রোগ

সংক্রামক রোগ ঃ বায়ু, পানি, ইত্যাদি বাহিত রোগজীবাণু মানবদেহে যে রোগের সূচনা করে তাকে সংক্রামক রোগ বলে।
যেমন – কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি

☒ ফাস্ট এইড বক্স কি?

প্রাথমিক চিকিৎসার উপযোগী সরঞ্জাম সম্বলিত বক্স হলো ফাস্ট এইড বক্স। বক্সে কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ, এন্টিবায়োটিক, এন্টিসেপটিক, তুলা, ব্যান্ডেজ, কাঁচি, ছোট ছুরি ইত্যাদি থাকে।

☒ ফরেন্সিক মেডিসিন কি?

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সমাধানের জন্য মেডিক্যাল সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা চিকিৎসকের মতামতের প্রয়োজন হয়। এই সংক্রান্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষ শাখাটি ফরেন্সিক মেডিসিন নামে পরিচিত। লাশের ময়না তদন্ত, পচে-গলে যাওয়া লাশ সনাক্তকরণ, অস্থির বয়স, প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ণয়, পোশাক কিংবা দেহে লেগে থাকা রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, দেহবিশেষ থেকে বের করা গুলির অংশবিশেষ পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফরেন্সিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মতামত দিয়ে থাকেন।

Scanned by CamScanner

BCS প্রশ্নাবলী

Biotechnology

☒ নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : (৩৫তম BCS)

মিনহাজ দধি তৈরির জন্য সন্ধ্যার সময় ফুটন্ত দুধে বাসি দধির সামান্য অংশ starter cul-ture হিসাবে মিশ্রিত করলো। কিছু সময় পর দুধ ঠান্ডা হলে সারারাত ৩৭-৪০° C তাপমাত্রায় Incubate করলো। পরদিন সকালে মিনহাজ লক্ষ্য করলো দুধ জমাট বাঁধেনি এবং কাঙ্ক্ষিত দধি তৈরি হয়নি।

ক. জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত তিনটি দুগ্ধজাত খাদ্যের নাম লিখুন।

দুধ থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। যেমন- দুধ থেকে মাখন, পনির, দই ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী তৈরির জন্য জীব প্রযুক্তির দ্বারা নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার হচ্ছে।

১. মাখন : মাখন তৈরি ও মাখনে বিশেষ সুগন্ধ ও স্বাদ সৃষ্টি করা হয় Streaptococcus Lactous এবং কিছু সুগন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন এনজাইমের দ্বারা।

২. পনির : পনির তৈরিতে Streaptococcus lactobacillus ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাক প্রয়োগ করা হয়। এতে পনিরের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের তারতম্য ঘটে। পৃথিবীর সুস্বাদ পনির উৎপাদনের জন্য ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য বিখ্যাত। এই উৎকৃষ্ট মানের পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে জীব প্রযুক্তির দ্বারা।

৩. দই : দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা থাকায় তা থেকে দই বা দইজাতীয় খাদ্যদ্রব্য lactobacillus ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে উৎপাদন করা যায়। Lactobacillus ব্যাকটেরিয়া দুধের জমাট ঘন অবস্থা সৃষ্টি করে দই- এ রুপান্তরিত করে। এক্ষেত্রে ল্যাকটো ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়ার বীজ ব্যবহার করা হয়। মুলত এর গুণাগুণের ওপরেই দই- এর গুণাগুণ নির্ভর করে।

খ. উদ্দীপককে উল্লেখিত starter culture কী? এতে কী থাকে?

উদ্দীপকে উল্লেখিত starter culture হলো বাসি দই। এতে ব্যাকটেরিয়া থাকে। দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা থাকে। ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় দুধের ননী জমে দই তৈরি হয়। স্টার্টার কালচার এর উপর দই-এর গুণাগুণ নির্ভর করে।

গ. মিনহাজের দধি তৈরিতে ব্যর্থতার কারণ কী?

দই সঠিকভাবে পাত্রে জমানোর ক্ষেত্রে তাপমাত্রা একটি বড় বিষয়। এটি খুব গরম হলেও সমস্যা, আবার খুব ঠান্ডা হলেও দই জমে না। সাধারণভাবে কক্ষ তাপমাত্রায় (২৩-২৬°C) উষ্ণ পরিবেশ দই তৈরির জন্য উপযোগী। দই তৈরির জন্য দুধ না ফুটিয়ে 40° C তাপমাত্রায় দুধ ঘন করে বাসি দই মিশিয়ে ভালভাবে নেড়ে এরপর তা জমাটবদ্ধ হওয়ার জন্য কক্ষ তাপমাত্রায় ৬-৭ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। মিনহাজ দুধ ঠান্ডা হলে সারারাত ৩৭-৪০° C তাপমাত্রায় Incubate করলো যা দুধ জমাট বাঁধার ক্ষেত্রে অত্যধিক উষ্ণ। সেজন্য মিনহাজ দধি তৈরিতে ব্যর্থ হলো।

ঘ. দুধ দধিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন।

দই তৈরির উপাদান হলো দুধ, বাসি দই; মিষ্টি করার প্রয়োজনীয় চিনি। প্রথমে চিনিকে একটি পাত্রে নিয়ে পানি দিয়ে গলিয়ে ক্যারামেল তৈরি করতে হবে। এবার অন্য একটি পাত্রে দুধ নিয়ে চুলায় মাঝারি আঁচে গরম করতে হবে। দুধ না ফুটিয়ে 40° C তাপমাত্রায় দুধ ঘন করতে হবে এবং ক্যারামেল মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর একটি পাত্রে ঢেলে (সম্ভব হলে মাটির পাত্রে) নিতে হবে। এবার চা চামচের মাথায় করে সিকি চামচ বাসি দই দুধের মাঝে ভালো করে মেশাতে হবে। এরপর পাত্রটি কক্ষ তাপমাত্রায় (২৩-২৬°C) উষ্ণ জায়গায় রেখে দিলে ৬/৭ ঘন্টা পর দুধ জমে দই হবে।

☒ মানুষের দেহকোষে কয়টি ক্রোমোজোম থাকে? এদের মধ্যে কয়টি সেক্স ক্রোমোজোম? (৩৫তম BCS)

নিউক্লিয়াসের ভিতরে অবস্থিত নিউক্লিওপ্রোটিনে গঠিত যে সব তন্তুর মাধ্যমে জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাকে ক্রোমোজোম বলে। মানুষের দেহকোষে মোট ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। এর মধ্যে ২২ জোড়া অটোসোম এবং ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম।

Scanned by CamScanner

☒ জিন (gene) বলতে কী বোঝায়? জেনেটিক বিশৃঙ্খলার দুটি কারণ লিখুন। (৩৫তম BCS)

জিন ক্রোমোজোমে অবস্থিত DNA অণুর সুনির্দিষ্ট কার্যকর সংকেত আবদ্ধ করে এবং প্রোটিন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বৈশিষ্ট্য বিকাশ ঘটায়। অন্যভাবে, জিন ক্রোমোজামের একটি অংশ যা একটি কর্মক্ষম পলিপেপটাইড শিকল গঠনের উপযুক্ত বার্তা বহন করে। এটি ক্রোমো-সোমের লোকাসে অবস্থিত DNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকুয়েন্স বা জীনের একটি নির্দিষ্ট কার্যকর সংকেত আবদ্ধ করে এবং প্রোটিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বৈশিষ্ট্যে বিকাশ ঘটায়।

জেনেটিক বিশৃঙ্খলার প্রধান দুটি কারণ :

জিন অথবা ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার জন্য যে সমস্ত রোগের সৃষ্টি হয় তাকে জেনেটিক বিশৃঙ্খলা বলে।

১. পয়েন্ট মিউটেশন বা জিনের ভিতর পরিবর্তন ;

২. ক্রোমোজোম সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি অথবা কোনো অংশের হ্রাস-বৃদ্ধি

☒ DNA টেস্টের মাধ্যমে বিবাদমান দম্পতির পিতৃপরিচয় কীভাবে নিশ্চিত করা যায় ? (৩৫তম BCS)

যখন কোনো সন্তানের পিতৃত্ব মাতৃত্ব নিয়ে বিবাদমান দম্পত্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তি যখন কোন সন্তানের পিতৃত্ব-মাতৃত্ব দাবি করে, তখন ডিএনএ টেস্ট দ্বারা এ ধরনের বিবাদ নিস্পত্তি করা যায়। ডিএনএ টেস্ট করার জন্য পিতা, মাতা ও সন্তানের মুখগহ্বর থেকে কটন বাড-এর মতো বিশেষ এক ধরনের ব্যবস্থার দ্বারা মুখের ঝিল্লির (মিউকাস) পর্দা নেওয়া হয়। গবেষণাগারে নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা উক্ত ঝিল্লি থেকে পিতা, মাতা ও সন্তানের ডিএনএ-র একটি চিত্র (প্রোফাইল) প্রস্তুত করা হয়। এরপর সন্তানের ডিএনএ-এর চিত্রের সাথে পিতামাতার ডিএনএ চিত্রের সাথে মিলানো হয়। যদি প্রত্যেকের সাথে প্রায় ৫০% মিল পাওয়া যায়, তাহলে তাদের সেই সন্তানের জৈব পিতামাতা (Biological Parents) অর্থাৎ প্রকৃত পিতামাতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

☒ কৃষিবিজ্ঞানে GMO- এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। (৩৫তম BCS)

জিএমও হলো জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম। কৃত্রিমভাবে কোন জেনেটিক ইনফরমেশন, অর্গানিজমে ঢুকিয়ে জিএমও তৈরি করা হয়। কোন একটি অর্গানিজমে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের নিউক্লিওটাইড সিকুয়েন্স অর্থাৎ অ্যালিয়েন ডিএনএ পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে ঢুকিয়ে অর্গানিজমকে জেনেটিক্যালি মেনিপুলেট করে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করা হয়। এটিই জিএমও। আশির দশক থেকে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, ফসলের গুণাগুণ ও স্বাদের পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে জিএমও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সয়াবিন, টমেটো, আলু, ভুট্টা, তুলা ও ধান এর জিএমও সারা বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। এটি বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বাড়িয়েছে এবং বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে মানব স্বাস্থ্যের উপর জিএমও খাদ্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। গবেষণায় বেরিয়ে আসছে ক্ষতিকর দিকগুলো। জিএমও ফসলের অন্য জীব থেকে ঢোকানো জেনেটিক ইনফরমেশন মানুষ হজম করতে পারে না, কখনও কখনও রক্তের মাধ্যমে সাধারণ ডিএনএ এর সাথে মিশে যেতে পারে। এর ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকি খুব বেড়ে যেতে পারে; সেক্স ক্রোমোজোমে প্রভাব পড়তে পারে এবং সেক্স ইনফার্টিলিটি দেখা দিতে পারে; মানবদেহে ফুড এলার্জি তৈরি হতে পারে বা মানবদেহে ভয়ংকর কোন রোগ তৈরি করতে পারে। জিএমও শস্যের তেজস্ক্রিয়তা যে জমিতে প্রয়োগ করা হবে সেখানে অন্য কোন ফসলের বীজ উৎপাদন নাও হতে পারে। জিএমও ফসলের বীজের জন্য এমনিতেই আমাদের বিদেশি কোম্পানিগুলোর উপর নির্ভর হতে হবে। আবার কৃষক জমির ফসল হতে বীজ তৈরি করতে না পারলে বাংলাদেশের সিড ইন্ডাস্ট্রিগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের জমি ও কৃষি তার শস্যমান হারাবে। ইতোমধ্যে বিটি বেগুন সহ একাধিক ফসল কৃষকদের মাঝে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। জিএমও ফসলের প্রবর্তন আমাদের ভারসাম্যহীন ইকোসিস্টেম তৈরি করবে। কাজেই কেবল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, মানসম্মত খাদ্য ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিতে হবে।

Scanned by CamScanner

☒ ক্রোমোজোম (Chromosime) ও জীন (Gene)-এর পার্থক্য কি? (২৪ ও ১৫তম BCS)

ক্রোমোজোম	জীন
কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে লম্বাসুতার মত কতগুলো বস্তু দেখা যায়, এইগুলোকে ক্রোমোজোম বলে।	জীন হচ্ছে ক্রোমোজমের এমন ক্ষুদ্র অংশ যা মিউটেশন, পুনর্বিন্যাস ও শারীরবৃত্তিমূলক কাজের একটি অখন্ড ও অবিভাজ্য একক
ক্রোমজোমের অবস্থান কোষের নিউক্লিয়াসে	ক্রোমোজমের একটি নির্দিষ্ট লোকাস (locus) বা সাইটে (site) জীনের অবস্থান
সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমজোম চার প্রকার। যথা:- মেটাসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক, ও টেলোসেন্ট্রিক	জীন তিনটি উপ একক নিয়ে গঠিত। যথা:– সিস্ট্রন, মিউটন, রিকন
ক্রোমজোম হলো বংশগতির ধারক ও বাহক	জীন হলো ক্রোমজোমে অবস্থিত বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক

☒ ক্রোমোজোম কি? ক্রোমোজোম কোষের কোথায় অবস্থান করে? (২২তম BCS)

ক্রোমোজোম হচ্ছে জীবকোষের বংশবৃদ্ধির একক যা জীব বহন করে। ক্রোমোজোমের দ্বারা ছেলে বা মেয়ে হওয়া নির্ধারিত হয়। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে *DNA* কোষের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম থাকে।

☒ "জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং" কি? এর একটি প্রয়োগ আলোচনা করুন? (২০তম BCS)

জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ এক কোষ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট জীন দিয়ে অন্য কোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করার ক্ষমতাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়।

প্রয়োগ ঃ 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর প্রয়োগ হচ্ছে ক্লোনিং। ক্লোনিং পদ্ধতিতে হুবহু একই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রাণীর জন্মদান করা যায়। ১৯৯৭ সালে ফিন ডারসেট ভেড়ির ওলান থেকে সংগৃহীত কোষের নিউক্লিয়াস অন্য জাতের একটি ভেড়ির ডিম্বকোষে প্রতিস্থাপিত করে হুবহু একই রকম একটি ফিনডারসেট ভেড়ির বাচ্চা জন্মাতে সক্ষম হন। এর নাম রাখা হয় ডলি। এর আগে ভ্রুণ কোষ থেকে প্রাণী জন্ম দেয়া হলেও এই প্রথম একটি পরিণত দেহকোষ থেকে নকল প্রাণী জন্ম সম্ভব হয়েছে।

☒ পরিপাকযন্ত্রের মধ্যে হজমে সাহায্যকারী উপাদান কি কি? (১৮তম BCS)

মুখবিবর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত অনিয়মিত যে নালি বিদ্যমান তা-ই পরিপাকযন্ত্র। পরিপাকন্ত্রে বিভিন্ন অংশ/ধাপ থেকে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান হজমের জন্য বিভিন্ন হজমকারক এনজাইম বা উপাদান নিঃসরিত হয়ে থাকে। যেমন- মুখবিবরের লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় টায়ালিন, পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত হয় পেপসিন, রেনিন ও লাইপেজ এবং অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত হয় ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ ।

☒ 'জিন ব্যাংক' বলতে কি বুঝায়? (১৩তম BCS)

জিন ব্যাংক এক ধরনের বিশেষ ব্যাংক । এতে বংশগতির ধারা বহনকারী জিন $(gene)$ পরিবেশে সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয়।

Teacher Work — Biotechnology

- ❑ DNA
- ❑ RNA
- ❑ DNA Test
- ❑ Forensic Test
- ❑ Nanotechnology
- ❑ Pharmacology
- ❑ Genetically modified organism

Scanned by CamScanner

Student Work — Biotechnology

☒ ক্লোনিং কি?

পরিণত প্রাণীর দেহকোষের নিউক্লিয়াস ডিম্বকোষে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে হুবহু একই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রাণী জন্মদান প্রক্রিয়াকে ক্লোনিং বলে। স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী ড. ইয়ান উইলমুট ১৯৯৭ সালে ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে একটি ভেড়া জন্ম দেন। এটির নাম ছিল ডলি।

☒ নিষেক কি?

যে প্রক্রিয়ায় দুটি জনন কোষ অর্থাৎ শুক্রানু ও ডিম্বানু মিলিত হয়ে ডিম্বানুকে সক্রিয় করে তোলে এবং পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীর হ্যাপ্লপয়েড সংখ্যক ক্রোমজোমের মিলনের ফলে প্রাণীর দেহকোষ ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে নিষেক বলে।

☒ ক্রোমোজোম কি? এর কাজ লিখুন।

ক্রোমোজোম : নিউক্লিয়াসের ভেতরে অবস্থিত নিউক্লিওপ্রোটিন-এ গঠিত যেসব তন্তুর মাধ্যমে জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়, তাকে ক্রোমোজোম বলে। গ্রীক শব্দ Chroma (অর্থ রং) এবং soma (অর্থ দেহ) এর সমন্বয়ে chromosome শব্দটি তৈরি। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ষ্ট্রাসবুর্গার সর্বপ্রথম ক্রোমোজোম আবিস্কার করেন।

ক্রোমোজোমের কাজ:

i. DNA তথা জিন অণু ধারণ করে।
ii. প্রজাতির বৈশিষ্ট্যকে বংশ পরম্পরায় বহন করে।
iii. DNA-র মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষ করে কোষের যাবতীয় জৈব রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
iv. বিভিন্ন কারণে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গঠন যে পরিবর্তন ঘটে তা বিবর্তনের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে।

ক্রোমোজোমের আকৃতি ও গঠন বর্ণনা করুন।

ক্রোমোজোমের আঙ্গিক গঠন পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত সময় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ পর্যায়। এ সময় একটি আদর্শ ক্রোমোজোম যেসব অংশ দেখা যায় তা হলো :

ক. **ক্রোমোনেমা (Chromonema) :** মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে যে দুটি অংশে বিভক্ত হয় তাদের প্রতিটির নাম ক্রোমাটিড। প্রতিটি ক্রোমাটিড লম্বালম্বিভাবে দুটি অথবা চারটি সূত্রাকার অংশ নিয়ে গঠিত। এ রকম একেকটি অংশের নাম ক্রোমোনোম।

খ. **সেন্টোমিয়ার (Centromere) :** মেটাফেজ দশায় প্রত্যেক ক্রোমোজোমে যে গোল, বর্ণহীন ও সংকুচিত স্থান দেখা যায় তার নাম সেন্ট্রোমিয়ার। স্বল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক ক্রোমোজোমে একটি মাত্র সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।

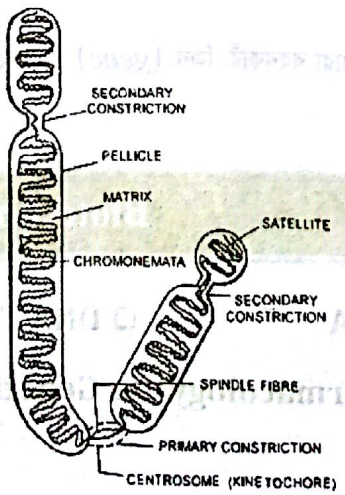

চিত্র ঃ ক্রোমোজোমের স্থূল গঠন

Scanned by CamScanner

গ. **বাহু (Arm):** সেন্ট্রোমিয়ারের উভয় পাশের অংশকেই ক্রোমোজোমের বাহু বলা হয়।

ঘ. **ক্রোমোমিয়ার (Chromomere):** মায়েটিক প্রোফেজ-এর সূচনালগ্নে ক্রোমোজোমের দেহে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা দেখা যায় সেগুলো ক্রোমোমিয়ার নামে পরিচিত। মায়োসিসের প্রথম প্রোফেজের প্যাকাইটিন উপদশায় ক্রোমোমিয়ারের নামে পরিচিত। মায়োসিসের প্রথম প্রোফেজের প্যাকাইটিন উপদশায় ক্রোমোমিয়ারের সংখ্যা ও অবস্থান স্পষ্ট দেখা যায়।

ঙ. **পেলিকল (Pellicle):** ম্যাক ক্লিনটক, সোয়ানসন প্রমুখ কোষবিজ্ঞানী ধারণা করতেন যে, ক্রোমোজোম দেহের অংশগুলো একটি বহিঃপর্দা দিয়ে আবৃত। কিন্তু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে ক্রোমোজোম বহিঃপর্দার অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।

চ. **ধাত্র (Matrix):** কোষবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, পেলিকসে আবৃত অবস্থায় ক্রোমোনেমাটা একটি তরল ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স-এ ভাসমান থাকে। কিন্তু ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ধাত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি।

ছ. **সেকেন্ডারি কুঞ্চন (Secondary constriction):** ক্রোমোজোমের দেহে সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া অন্য কোনো কুঞ্চন থাকলে তা সেকেন্ডারি কুঞ্চন নামে অভিহিত হয়। SAT (Sine Acid Thymonucleic) নামক সেকেন্ডারি কুঞ্চন নিউক্লিওলাস গঠনে সাহায্য করে। সেকেন্ডারী কুঞ্চন অঞ্চলে DNA অণুর কুন্ডলন অন্যান্য স্থানের কুন্ডলন অপেক্ষা কম।

জ. **স্যাটেলাইট (Satellite):** ক্রোমোজোমের একপ্রান্তে সেকেন্ডারি কুঞ্চন থাকলে সংলগ্ন ক্ষুদ্র অংশটিকে স্যাটেলাইট বলে। স্যাটেলাইট একটি সূক্ষ্ম তন্তুর সহায়তায় ক্রোমোজোমের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত থাকে।

ঝ. **টেলোমিয়ার (Telomere):** প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এইচ.জে.মুলার ক্রোমোজোমের প্রান্তদেশে টেলোমিয়ার নামক একটি বিন্দুর অবস্থান কল্পনা করেন। তিনি ধারণা করেন, টেলোমিয়ারের অবস্থানের কারণেই কোনো ক্রোমোজোমের দুটি প্রান্ত পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না।

☒ ক্রোমোজোম রাসায়নিক গঠন লিখুন।

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। এটি নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন, ধাতন আয়ন ও বিভিন্ন এনজাইম নিয়ে গঠিত।

ক্রোমোজোমে দুধরনের নিউক্লিক অ্যাসিডই পাওয়া যায়। যথা- DNA ও RNA । প্রোটিন রয়েছে দুধরনের। যথা-হিস্টোন ও নন-হিস্টোন। হিস্টোন প্রোটিন ৪ রকম। যথা H_1, H_2 (A ও B), H_3 ও H_4। নন-হিস্টোন প্রোটিন রয়েছে প্রায় ৫০০ ধরনের। ক্রোমোজোমে DNA পলিমারেজ RNA পলিমারেজ, নিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফাটেজ প্রভৃতি এনজাইম পাওয়া যায়। তাছাড়া, Ca++, Fe++ প্রভৃতি ধাতব আয়নও রয়েছে। এগুলো ক্রোমোজোমের গঠনকে স্থায়ী করতে সাহায্য করে।

☒ নিউক্লিক অ্যাসিড কি? এর অবস্থান ও প্রকারভেদ লিখুন।

নিউক্লিক অ্যাসিড : যে বায়োপলিমার অণুসমূহ বংশগতির ধারা সংরক্ষণে এবং কোষস্থ প্রোটিন ও এনজাইম সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে থাকে তাদেরকে নিউক্লিক অ্যাসিড বলে।

অবস্থান : নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম ছাড়াও সাইটোপ্লাজমে এবং কিছু কিছু অঙ্গাণুতে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। নিউক্লিক অ্যাসিড দুই প্রকার। যথা-

০১. ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) এবং

০২. রাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) ।

☒ DNA (Deoxyribonucleic Acid) কি? এর কাজ উল্লেখ করুন।

DNA ক্রোমোজোমের একমাত্র স্থায়ী রাসায়নিক পদার্থ এবং বংশগতি বৈশিষ্ট্যের বাহক। ১৮৬৮ সালে Miescher প্রথম DNA আবিষ্কার করেন। তিনি একে নিউক্লিন (nuclein) অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। DNA-র গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ওয়াটসন ও ক্রিক (James Watson) & Francis Crick, 1953)-এর আবিস্কারের মধ্য দিয়ে।

Scanned by CamScanner

DNA এর কাজ/ জৈবিক গুরুত্ব :

i. DNA বংশগতিয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক।
ii. DNA জীবদেহের সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।
iii. DNA প্রোটিন সংশ্লেষণ করে।
iv. DNA প্রতিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবের জাতিসত্তা অটুট রাখে।
v. DNA জীবের সকল বিপাকীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।
vi. DNA প্রজাতি শনাক্তকরণে ভূমিকা রাখে।

☒ **DNA -এর ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক গঠন বর্ণনা করুন।**

DNA-এর ভৌত ধর্ম : DNA-র আণবিক ওজন $১০^৬$ থেকে $১০^৯$ এর মধ্যে। ১০০°C তাপমাত্রায় DNA অণু ভেঙ্গে দুটি অণু গঠন করে। অতি বেগুনী (বা আলট্রা ভায়োলেট, UV) আলোকরশ্মি শোষণের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি।

DNA-র রাসায়নিক গঠন : DNA গঠিত হয় পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট ডি-অক্সিরাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট এবং অ্যাডেনিন (Adenine), গুয়ানিন (Guanine), সাইটোসিস (Cytosine) ও থাইমিন (Thymine) নামক নাইট্রোজেনযুক্ত বেস দিয়ে। অ্যাডেনিন ও গুয়ানিনকে বলা হয় পিউরিন (Purine) এবং সাইটোসিন ও থাইমিনকে বলে পাইরিমিডিন (Pyrimidine) ।

এক অণু ডি-অক্সিরাইবোজ শর্করা, এক অণু নিউক্লিওসাইডের সঙ্গে এক অণু অজৈব ফসফেট সংযুক্ত হয়ে এক অণু নিউক্লিওটাইড গঠন করে। দুটি নিউক্লিওটাইড একসাথে যুক্ত হয়ে ডাইনিউক্লিওটাইড, তিনটি যুক্ত হয়ে ট্রাইনিউক্লিওটাইড এবং ততোধিক যুক্ত হয়ে পলিনিউক্লিওটাইড গঠন করে।

☒ **RNA-এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন বর্ণনা করুন। RNA-এর কাজ লিখুন।**

ভৌত গঠন : RNA-এক সূত্রক চেইন-এর মতো। এটি স্থানে স্থানে কুন্ডলিত অবস্থায় থাকে। এর গঠনে একাধিক U-আকৃতির ফাঁস (hairpin loop) বা লুপ থাকে।

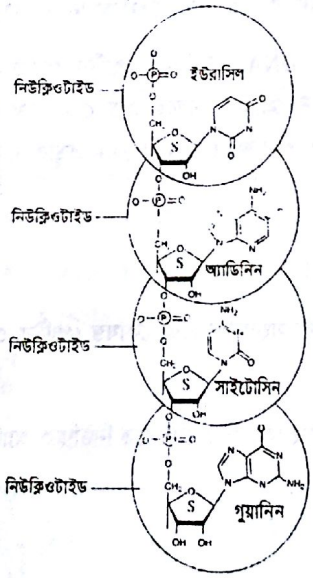

চিত্র : RNA অণুর একাংশ।

রাসায়নিক গঠন : নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে RNA গঠিত হয়।

i. রাইবোজ শ্যুগার পেন্টোজ শ্যুগার); এটি পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট।
ii. নাইট্রোজিনাস বেস (ক্ষারক)-অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল এবং সাইটোসিন।
iii. ফসফেট (ফসফোরিক অ্যাসিড)।
iv. উক্ত চারটি বেস ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য বেসও থাকতে পারে।

Scanned by CamScanner

RNA-এর কাজ:

i. RNA-এর প্রধান কাজ প্রোটিন সংশ্লেষ।
ii. RNA-অ্যামিনো এসিড স্থানান্তর করে।
iii. RNA-রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন গঠন করে।
iv. RNA, DNA হতে বার্তা বহন করে রাইবোজোমে পৌঁছায়।

☒ জিন কি? জিনের কাজ উল্লেখ করুন।

জিন : একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী পলিনিউক্লিওটাইড চেইনের অংশ বিশেষ হলো জিন।

জিনের কাজ :

i. জিন হলো বংশগতির ধারক ও বাহক।
ii. কোষ বিভাজনের সময় জিন বা DNA তার নির্ভুল অনুলিপন কার্য সম্পন্ন করে।
iii. প্রোটিন সংশ্লেষণসহ অন্যান্য কাজের জন্য RNA সংশ্লেষণ করে।
iv. জিন জাইগোট থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবে রূপান্তর প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে।
v. জিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোষের সকল জৈবিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
vi. জিন কোষে সকল প্রকার জৈবনিক সংকেত প্রেরণ করে।
vii. জিনের গঠন কাঠামো সাধারণত স্থায়ী হয়। তবে বিশেষ কারণে Mutation ঘটে থাকে।

☒ ডিএনএ (DNA) টেষ্ট কি?

ডিএনএ টেষ্ট হলো একটি অত্যাধুনিক শনাক্তকরণ পদ্ধতি। যাতে কোষের মধ্যে অবস্থিত ডিএনএ এর মাধ্যমে কোনো মানুষকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে জেনেছেন যে মানুষের ডিএনএ এর মধ্যে এমন কিছু নিউক্লিওটাইড রিপিট থাকে যা নির্দিষ্ট মাতা এবং পিতার সঙ্গে কেবল তাদের সন্তানেরাই ভাগ করে নেয়। উল্লেখ্য, সহোদর যমজ ছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই ডিএনএ সজ্জা আলাদা।

☒ ফরেনসিক টেষ্ট কি?

ফরেনসিক কথাটির উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'ফরেনসিস' থেকে যার অর্থ প্রকাশ্যে উপস্থাপন। বিজ্ঞানভিত্তিক যে কোনো তথ্যই আদালতে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য, যা সত্য উদঘাটনে বা অপরাধীকে শনাক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তাকে ফরেনসিক টেষ্ট বলা হয়।

☒ জৈব প্রযুক্তি (Biotechnology) কাকে বলে ?

মানবকল্যাণে জীবের প্রযুক্তিগত ব্যবহারের কলাকৌশলকে জৈবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি বলে। আমেরিকার National Science Foundation প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী-কল্যাণের উদ্দেশ্যে জীবজ প্রতিনিধিদের, যেমন-অণুজীব বা কোষীয় উপাদানের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে জৈবপ্রযুক্তি বলা হয়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Ereky) সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন।

☒ ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ কি? এ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যে সব উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় সেগুলোকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে। এ প্রক্রিয়ায় রিকম্বিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে উৎপন্ন জীবকে হয় কোনো বাহকের মাধ্যমে নয়তো মাইক্রোইঞ্জেকশনের মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাষ্টে প্রবেশ করানো হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০ টি উচ্চতর উদ্ভিদ প্রজাতিতে এ প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু, লেটুস, সূর্যমুখী, বাঁধাকপি, তুলা, সয়াবিন, মটর, শসা, গাজর, মূলা, পেঁপে, আঙ্গুর কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ, আপেল, নাশপাতি, নিম, ধান, গম, রাই, ভুট্টা প্রভৃতি।

ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী ফসলকে আগাছানাশক, পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার ও ছত্রাক প্রতিরোধী করে উৎপাদন করা হচ্ছে। অনেক উদ্ভিদকে উষ্ণতা, শৈত্য, লবণাক্ততা, ভারী ধাতু, ফাইটোহরমোন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা হয়েছে। পাকা টমেটোর ত্বক নরম হয়ে যাওয়া প্রতিরোধে কিংবা দেরিতে পাকানো অথবা সুক্রোজের পরিমাণ বাড়িয়ে ষ্টার্চের পরিমাণ কমিয়ে টমেটো উৎপাদন ট্রান্সজেনিক প্রক্রিয়ারই সুফল। আলুতে ২০-৪০% ষ্টার্চ বাড়ানোও সম্ভব হয়েছে এ প্রক্রিয়ায়।

Scanned by CamScanner

☒ ট্রান্সজেনিক প্রাণী কি?

রিকম্বিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে উৎপন্ন জিনকে মাইক্রোইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রাণীর ডিম্বাণুর প্রোনিউক্লিয়াইয়ে প্রবেশ করানো হয়। পরে সে ডিম্বাণু কোনো স্ত্রী প্রাণীর দেহে স্থাপন করা হয়। ভ্রূণের সমগ্র পরিস্ফুটন কালে সে জিনকে আবার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এভাবে উদ্ভাবিত প্রাণীকে ট্রান্সজেনিক প্রাণী বলে।

☒ কৃষি উন্নয়নে জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

কৃষি উন্নয়নে জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. উদ্ভিদকোষ, কলা ও অঙ্গের কালচার।
২. রোগ-পতঙ্গ-বালাইনাশক প্রতিরোধী উদ্ভিদ উৎপাদন।
৩. সালোকসংশ্লেষণে বেশি সক্ষম, নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উন্নত সঞ্চয়ী প্রোটিন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন।
৪. যৌন জননে অক্ষম উদ্ভদ-প্রজাতির মধ্যে দৈহিক সংকরায়ণের মাধ্যমে প্রত্যাশিত বুনো গুণকে কৃষিজ শস্য উদ্ভিদে স্থানান্তর।
৫. বেশি মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী, দীর্ঘজীবী, সবল ও সুস্থ গবাদিপশু উদ্ভাবন।
৬. জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে উৎপন্ন গবাদিপশুর দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে ওষুধ উৎপাদন।

☒ ওষুধ শিল্পে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করুন ।

ওষুধ শিল্পে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার আলোচনা করা হলো:

১. ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষিত ইনসুলিন ও ইন্টারফেরনসহ বিভিন্ন হরমোন উৎপাদন।
২. বিভিন্ন মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক এবং রোগ-ব্যাধি সনাক্তকরণের জন্য অ্যান্টিবডি উৎপাদন।
৩. মানুষের বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন।
৪. রক্ত, বীর্যরস, মূত্র, অশ্রু, লালা ইত্যাদির DNA বা অ্যান্টিবডি থেকে খুনি সনাক্তকরণ।
৫. হৃদপিণ্ডে, মস্তিস্কে ও ফুসফুসে রক্ত জমাট প্রতিরোধক উপাদান উৎপাদন।

☒ দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরিতে জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

দুধ থেকে দই, ছানা, পনির ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে বহু বছর আগে থেকেই। আইসক্রীম, ঘি, দুগ্ধশর্করা, চকলেট ইত্যাদি তৈরিতেও দুধ ব্যবহৃত হয়। তখন থেকেই বিভিন্ন গ্রামীণ পদ্ধতি চালু থাকলেও প্রকৃত কারণটি জানা ছিল না। পরবর্তীতে গবেষণায় জানা যায় যে, বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এ জন্য দায়ী। ইতোমধ্যেই দুগ্ধজাত দ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণ ব্যাকটেরিয়ার কিছু নিজস্ব স্ট্রেন পৃথক করে নিয়েছেন, যার ফলে বিভিন্ন দোকানের দই, পনির ইত্যাদির স্বাদ ও গন্ধ ভিন্নতর। এ কারণেই ক্রেতা সাধারণ বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন দোকানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। সঠিক জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগ এনে দিচ্ছে ব্যবসায়িক সাফল্য, তৈরি হচ্ছে উত্তম পণ্য। বর্তমানে দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা থেকে একদিকে সরকার পাচ্ছে লাখ লাখ টাকার ভ্যাট, অপর দিকে হাজার হাজার লোক এ শিল্পে কর্মরত আছেন। দই, মিষ্টি, পনির এগুলো বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

দুধে বিভিন্ন প্রকার এনজাইম আছে। দুধ থেকে এসব এনজাইম আহরণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লাইপেজ, প্রোটিয়েজ, ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ, অ্যাসিড ফসফ্যাটেজ, লাইসোজাইম ইত্যাদি।

☒ জিন থেরাপি কি?

জীবের ক্ষতিকারক জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপনকে জিন থেরাপি বলে। জিন থেরাপি প্রোটিন অথবা এমনকি সঠিক জেনেটিক পরিব্যক্তির অভিব্যক্তির হস্তক্ষেপ।

☒ GMO (General Modified Organism) কি?

একটি জীবের জিনোম সিকোয়েন্স-এর সাথে নন-রিলেটেড স্পেসিস-এর জিন বা জিন সমষ্টি প্রবেশকরণের মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব উৎপন্ন করা হলে তাকে GMO বলে। আর GMO থেকে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যকে 'জেনটিক ফুড' বলা হয়। পরিবেশ বিপর্যয়, পতঙ্গ ও রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে GMO-এর উদ্ভব হয়েছে।

Scanned by CamScanner

☒ **ন্যানোপ্রযুক্তি (Nanotechnology) কি? এ সম্পর্কে আলোচনা করুন।**

ন্যানো শব্দটি গ্রিক nanos শব্দ থেকে এসেছে। যার অভিধানিক অর্থ হলো dwarft কিন্তু এটি মাপের একক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এই ন্যানোমিটার স্কেলে যে সমস্ত টেকনোলজিগুলো সম্পর্কিত সেগুলোকে বলে ন্যানোপ্রযুক্তি। ন্যানোপ্রযুক্তি পদার্থকে আণবিক পর্যায়ে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার বিদ্যা। রিচার্ড ফাইনম্যানকে ন্যানোপ্রযুক্তির জনক বলা হয়।

১৯৮০ সালে IBM এর গবেষকরা প্রথম আবিস্কার করেন STM (Scanning Tunneling Microscope) এ যন্ত্রটি দিয়ে অণুর গঠন পর্যন্ত দেখা সম্ভব। এ যন্ত্রটির আবিস্কারই ন্যানোপ্রযুক্তিকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। ন্যানোটেকনোলজির ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া আছে। একটি হলো উপর থেকে নিচে (Top to Bottom) ও অপরটি হলো নিচ থেকে উপর (Bottom to Top)। টপ টু বটম পদ্ধতিতে কোনো জিনিসকে কেটে ছোট করে তাকে নির্দিষ্ট আকার দেয়া হয়। আর বটম টু টপ হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের ছোট জিনিস দিয়ে বড় কোনো জিনিস তৈরি করা। আমাদের বর্তমান ইলেকট্রনিক্স হলো টপ টু বটম প্রযুক্তি। আর ন্যানোটেকনোলজি হলো বটম টু টপ প্রযুক্তি। ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স, শক্তি উৎপাদনসহ বহু ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। অপরদিকে পরিবেশের উপর এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নিয়েও সংশয় রয়েছে।

☒ **ফার্মাকোলজি (Pharmacology) কি?**

ফার্মাকোলজি শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'pharmacon' থেকে। যার আভিধানিক অর্থ 'বিষ' এবং 'Logos' যার অর্থ 'বিজ্ঞান'। ফার্মাকোলজি ফার্মেসি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো দেহের উপর ওষুধের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। সুতরাং ফার্মাকোলজি হলো দেহে বাহ্যিকভাবে প্রবেশক্রিত রাসায়নিক পদার্থের সাথে দেহের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

☒ **ফার্মাকোলজির প্রধান শাখা কয়টি ও কি কি?**

ফার্মাকোলজির প্রধান শাখা হলো ২টি। যথা : i. Pharmacokinetics; এবং ii. Pharmacodynamics.

☒ **Pharmacokinetics কি?**

যখন ওষুধ আমাদের দেহে প্রবেশ করে তখন দেহ সরাসরি তার উপর কাজ করতে শুরু করে। ওষুধের শোষণ, বন্টন, বিপাক এবং নিস্কর্ষণ নিয়েই হলো Pharmacokinetics.

BCS প্রশ্নাবলী — Food & Nutrition

☒ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :** **(৩৫তম BCS)**

শতায়ু করিম সাহেব– এর নিয়মিত প্রাতঃভ্রমনের সঙ্গী হওয়ার জন্য তাঁর কোনো বন্ধু-বান্ধবই আজ আর বেঁচে নেই। তিনি স্বল্পাহারী মানুষ। সারাজীবনই তেল-চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করেছেন। টাটকা ফলমূল, সালাদ ও শাক-সবজী তাঁর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অংশ ছিল। কৈশোর ও যৌবনে নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করেছেন। তিনি সৎ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। সবসময় মানুষের মঙ্গল চিন্তা করেছেন এবং ধর্মপরায়ণ মানুষ হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন।

ক. ভিটামিন, এন্টি-অক্সিডেন্ট ও ফ্রি-রেডিক্যাল কী?

ভিটামিন : ভিটামিন এক বিশেষ ধরনের জৈব যৌগ যা প্রাণিদেহে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন কিন্তু এর অভাবে দেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপে বিঘ্ন ঘটে। এরা বিপাকীয় জৈব প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। ভিটামিনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেহ গঠনে অংশগ্রহণ না করলেও এদের অভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন বা দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলো সুসম্পন্ন হতে পারে না।

এন্টি-অক্সিডেন্ট : এন্টি-অক্সিডেন্ট শব্দের শাব্দিক অর্থ যা ইলেকট্রন প্রদানে সক্ষম।

এন্টি-অক্সিডেন্টসমূহ : ভিটামিন ই, ভিটামিন সি, ক্যারোটিনয়েড (আলফা ক্যারোটিন, বিটা ক্যারোটিন), গ্লুটাথায়ন, লিপোইক এসিড, বায়োফ্লাভোনয়েড, খনিজ লবণ, লাইকোপিন, ক্রিপ্টোজ্যান্থিন, লিডটেন, ট্যানিন, সোলেনিয়াম আয়রন, জিংক, ভিটামিন এ প্রভৃতি। এন্টি-অক্সিডেন্টগুলো ফ্রি-র‍্যাডিক্যালদের নিষ্ক্রিয় রাখে এবং নিজেরা নিজেদের কাজে সহযোগিতা করে। একটি এন্টি-অক্সিডেন্ট অণু ফ্রি-র‍্যাডিক্যালকে ইলেকট্রন প্রদান করার মাধ্যমে ফ্রি-র‍্যাডিকেলকে নিষ্ক্রিয় করে।

ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল : একাধিক পরমাণু পরস্পর যুক্ত হওয়ার সময় ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যদি নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে না পারে তবে অস্থিতিশীল ও ভরসাম্যহীন পদার্থ তৈরি হয়। এদের ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল বলে। আমাদের শরীরে রাসায়নিক বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি তথা এটিপি তৈরি হয়। এই এটিপি তৈরি হওয়ার সময় উপজাত হিসেবে অক্সিজেন থেকে ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল তৈরি হয়।

Scanned by CamScanner

খ. মানবদেহে ফ্রি-রেডিক্যালের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

মানবদেহে ফ্রি-র‍্যাডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এগুলো খুবই ধ্বংসাত্মক। এগুলো চর্বি, আমিষ, শর্করা, ডিএনএ প্রভৃতিকে আক্রমণ করে এবং দেহের বিশাল ক্ষতিসাধন করে। কোন সুস্থ টিস্যু ফ্রি-র‍্যাডিক্যালের আক্রমণের শিকার হলে পরবর্তীতে আর ভালভাবে কাজ নাও করতে পারে। যেমন– কোষ কলার আবরণীগুলোর দ্বারা আক্রান্ত হলে সঠিকভাবে পুষ্টি উপাদানের স্থানান্তর ব্যাহত হয় এবং ডিএনএ একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ফ্রি-র‍্যাডিক্যালের মাধ্যমে অনেক রোগের সূত্রপাত হতে পারে– সন্ধিবাত, হৃদরোগ, আলজেইমার্স, পার্কিনসন্স ইত্যাদি।

গ. স্বাস্থ্য রক্ষায় ভিটামিন ও এন্টি-অক্সিডেন্টের ভূমিকা কী?

ভিটামিন এ আমাদের দৃষ্টি সুরক্ষাকারী এবং দেহের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রাকৃতিক বিভিন্ন খাবারে (শাকসবজি ও ফলমূল) থাকা বিটা-ক্যারোটিন দেহের ভিতরে পরিবর্তিত হয়ে ভিটামিন এ-তে পরিণত হয়। ফল ও সবজিতে থাকা বিটা-ক্যারোটিন, আলফা ক্যারোটিন, লুটেইন, জিজান্থিন, লাইকোপেন, ক্রিপ্টাজ্যান্থিন শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্টের ভূমিকা পালন করে। একই সাথে ক্ষতিকর ফ্রি-র‍্যাডিক্যালকে নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে ক্যান্সার, অকাল বার্ধক্য, বাত, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগের হাত থেকে সুরক্ষা করে। ভিটামিন সি পানিতে দ্রবণীয় এন্টি-অক্সিডেন্ট যা চর্বিতে জমা থাকে না। এরা মুক্তভাবে রক্তরসে বিচরণ করে এবং দ্রুত ফি-র‍্যাডিক্যালদের ইলেকট্রন প্রদানের মাধ্যমে এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে।

সবচেয়ে শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট হলো ভিটামিন ই। আলফা, বিটা, গামা ও ডেল্টা টোকোফেরল, টোকোট্রাইনোল প্রভৃতি ভিটামিন ই পরিবারের সদস্য। এরা ফ্রি-র‍্যাডিক্যালকে ইলেকট্রন প্রদান করার এন্টি-অক্সিডেন্ট ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তবে অন্য একটা ভিটামিন সি গ্লুটাথায়ন অণু ভিটামিন ই অণুকে ইলেকট্রন প্রদান করে পুনরায় সক্রিয় করে তোলে।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত করিম সাহেবের জীবনাচরণ তাঁকে দীর্ঘায়ু প্রাপ্তিতে কীভাবে সাহায্য করেছে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করুন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে- সুস্থ খাদ্যাভ্যাস বলতে বোঝায় বেশি করে টাটকা ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়া, চর্বিবিহীন খাবার বর্জন বা কম চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ, চিনি ও লবণ গ্রহণে সতর্কতা, পরিমিত পানি ও আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ। শাকসবজি ও ফলমূলে স্টার্চ ও সেলুলোজজাতীয় উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকায় উদর পূর্তি হলেও ক্যালরি গ্রহণে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে। ফলে ওজন বৃদ্ধি ঘটে না। হজম না হওয়ায় সেলুলোজ মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে শরীরকে সুস্থ রাখে। শাকসবজি ও ফলমূল গ্রহণে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। চর্বিযুক্ত খাবারের পরিবর্তে শাকসবজি-ফলমূল গ্রহণ রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্র কমে হৃদরোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। করিম সাহেবের দৈনন্দিন খাদ্যগ্রহণ ছিল বিজ্ঞানসম্মত সুস্থ খাদ্যাভাসের দৃষ্টান্ত।

নিয়মিত ব্যায়াম বা প্রাতভ্রমণ, ক্যালরি ব্যয় এবং ক্যালরি গ্রহণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখলে ওজন এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করে তাদের অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ বাড়ে যা রক্তের সাথে মিশে দেহে সতেজতা বাড়ায়। প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে জগিং করলে ৬ বছর পর্যন্ত আয়ু বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া ধর্মীয় বিধিবিধান পালন করলে মানুষের জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, মানসিক প্রশান্তি বাড়ে যা শরীরকে সুস্থ রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করিম সাহেব কৈশোর ও যৌবনে নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করেছেন, তিনি সৎ ও ধর্মপরায়ন। এটি তাঁকে সুস্থ ও নীরোগ দেহ গঠনে সর্বোতভাবে সহায়তা করেছে, যা তাঁকে দীর্ঘায়ু প্রাপ্তিতে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে।

☒ খাদ্য দূষণ (Food poisoning) কী? সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দূষণের উদাহরণ দিন। (৩৫তম BCS)

খাদ্য দূষণ বা ফুড পয়জনিং এর মূলে থাকে অনিষ্টকারী ফাংগাস, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা প্যারাসাইট। এগুলো খাদ্য নষ্ট করে এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান উৎপন্ন করে। খাদ্যের এ অবস্থাকে খাদ্য দূষণ বলে। এই জীবাণুগুলো শরীরে প্রবেশ করে বমি ভাব, বমি করা ও পেট খারাপ লক্ষণ প্রকাশ করে।

সালামোনেল্লা, টক্সোপ্লাজমা গন্ডাই প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া পাখি, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণির অন্ত্রের মধ্যে থাকে। ভালভাবে মাংস রান্না না করলে এটি খাদ্যকে দূষিত করে। মাংস কাটার সময় যে ছুরি বা বাটি ব্যবহার করা হয়, সেই একই ছুরিতে সবজি কাটলে সবজিতে ব্যাকটেরিয়া এসে যেতে পারে। চাষের সময় ফলমূলেও এগুলো এসে যেতে পারে যদি সেগুলো ব্যাকটেরিয়া-দূষিত পানিতে ধোয়া হয় বা গোবর কিংবা অন্যান্য জন্তুর বিষ্ঠার সংস্পর্শে আসে। নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্তুজানোয়ারের শরীরে, মাটিতে, পানিতে, ধুলিতে রয়েছে। এগুলোর সংস্পর্শে এসে হাত ভাল করে না ধুয়ে খেলে খাবারে ব্যাকটিরিয়া এসে যেতে পারে।

☒ প্রোটিন কি? এর তিনটি গুরুত্ব লিখুন। (৩৩তম BCS)

আমিষ বা প্রোটিন হল এক ধরনের জৈব পদার্থ যা দেহের প্রাথমিক গঠন উপাদান। কার্বন (৫৪%), অক্সিজেন (২০%), হাইড্রোজেন (৭%), নাইট্রোজেন (১৫%) এবং কখনও কখনও সালফার (১%) ও ফসফরাসের (০.৬%) সমন্বয়ে প্রোটিন গঠিত। হরমোন ও এনজাইম প্রোটিন গঠনে সক্রিয়।

প্রোটিনের গুরুত্ব :

১. প্রোটিন দেহের গঠন ও বৃদ্ধিসাধন করে।
২. এটি দেহের ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সক্রিয়।
৩. এনজাইম, হরমোন, ইনসুলিন, পিত্তরস ইত্যাদির মাধ্যমে এটি দেহের জৈবিক কর্মকাণ্ড সূচারুরূপে পরিচালনা ভূমিকা পালন করে।

আমাদের দেহের বৃদ্ধি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ সময়ে আমিষের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দৈনিক আমিষের প্রয়োজন ৬৫ গ্রাম, পূর্ণবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে ও পরিমাণ ৫৫ গ্রাম।

Scanned by CamScanner

☒ **ভিটামিন 'এ', 'ডি' ও 'কে' এর কাজ কি? ভিটামিন 'এ', 'ডি' ও 'কে' এর অভাবে কি ঘটে?** **(৩১, ২৯ ও ২৫তম BCS)**

ভিটামিন 'এ'- এর কাজ ঃ

ক) ভিটামিন 'এ' দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখে এবং রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে। এটি দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
খ) চোখের রেটিনায় অবস্থিত রেডপসিন নামক এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ তৈরিতে ভিটামিন 'এ' সহায়ক।
গ) ইহা এপিথেলিয়াল কোষের অখণ্ডতা রক্ষায় সহায়তা করে।
ঘ) মানবদেহের যে কোন স্থানের ক্ষত প্রতিহত করে।
ঙ) কার্বোহাইড্রেট বিপাকে সহায়তা করে।

ভিটামিন 'ডি'- এর কাজ ঃ

ক) এই ভিটামিন দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়, হাড়কে শক্ত করে এবং বিকৃত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।
খ) এটি অন্ত্র হতে ক্যালসিয়াম আয়ন শোষণে সহায়তা করে এবং হাড়ের ও রক্তের ক্যালসিয়াম আয়নের সমতা রক্ষা করে।
গ) দাঁত ওঠা ও অস্থি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
ঘ) দাঁতের স্বাভাবিক অবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে এটি অত্যন্ত কার্যকরী।

ভিটামিন 'কে'- এর কাজ ঃ

ক) রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে। কেটে গেলে ভিটামিন 'কে' এর জন্যই রক্ত পড়া বন্ধ হয়।
খ) অস্থিতে ক্যালসিয়াম জমা করে হাড়কে মজবুত করে।
গ) শিশুদের নতুন হাড় বিকাশে সহায়তা করে।
ঘ) ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে সহায়ত করে।

ভিটামিন 'এ'- এর অভাবজনিত সমস্যা ঃ চর্বিতে দ্রাব্য ভিটামিন 'এ' বা রেটিনল- এর অভাবে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দেয় ঃ

১) রাতকানা রোগ হয় এবং অধিক অভাবজনিত কারণে অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে,;
২) দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়;
৩) স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নিম্নাঙ্গে ল্যাথারিজম হয় ও ভ্রূণের মৃত্যু ঘটে।

ভিটামিন 'ডি'- এর অভাবজনিত সমস্যা ঃ ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে হাড়ক্ষয় রোগ হয়। এই রোগ দুই ধরণের-

ক) বাচ্চাদের হাড়ক্ষয় রোগ কে বলা হয় রিকেটস্
খ) বড়দের বিশেষত মেয়েদের হাড়ক্ষয় রোগ কে বলা হয় অস্টিওম্যালেশিয়া।

ভিটামিন 'কে'- এর অভাবজনিত সমস্যা ঃ চর্বিদ্রাব্য ভিটামিন কে-এর অভাবে রক্ত জমাট বাঁধতে সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে রক্তপাত এর প্রবণতা দেখা দেয়।

☒ **ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ নিবারণে সবুজ শাকসবজি কিছু তেল দিয়ে রান্না করে খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এখানে তেলের ভূমিকাটা কি?** **(১৩ তম BCS)**

ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে পানিতে দ্রবীভূত নয় কিন্তু এরা চর্বি বা তেলে দ্রবীভূত। সবুজ শাকসবজিতে বিদ্যমান ভিটামিন 'এ' তেলে দ্রবীভূত হয়। কাজেই সবুজ শাকসবজিকে তেল সহযোগে রান্না করলে তা অপচয় হয় না এবং প্রায় সবটুকু ভিটামিন-এ সহজেই মানুষের শরীরে গ্রহণ উপযোগী হয়। এজন্যই তেল সহযোগে সবুজ শাকসবজি রান্না করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে।

Teacher Work — Food & Nutrition

- ❑ Elements of food
- ❑ Body mass index (BMI)
- ❑ Menu of balanced diet
- ❑ Fast food

Scanned by CamScanner

Student Work — Food & Nutrition

☒ খাদ্যের উপাদানগুলো কি কি?

খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এই রাসায়নিক বস্তুগুলোকে খাদ্য উপাদান বলে এই উপাদানগুলোমধ্যে পুষ্টি নিহিত, তাই খাদ্য উপাদানকে পুষ্টি উপাদানও বলা হয়। খাদ্যের মোট উপাদান ৬টি। এদের মধ্যে তিনটি প্রধান উপাদান। ১. আমিষ ২. শর্করা ৩. স্নেহ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য এছাড়া আরও তিন প্রকার উপাদানও দেহের জন্যে প্রয়োজন। ১. খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ২. খনিজ লবন ৩. পানি।

☒ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা কি ও এর উৎস লিখুন।

শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহের কাজ করার শক্তি জোগায়। শর্করার মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। উদ্ভিদের মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজে শর্করা বিভিন্নরূপে জমা থাকে। ফলের রসে গ্লুকোজ, দুধে ল্যাকটোজ, গম, আলু, চাল ইত্যাদিতে ষ্টার্চ বা শ্বেতসার ইত্যাদি শর্করা খাদ্যের বিভিন্ন রূপ।
শর্করার শ্রেণীবিভাগ

শর্করা শ্রেণি	গঠন	উদাহরণ	উৎস
এক শর্করা	এক অনুবিশিষ্ট শর্করা	গ্লুকোজ	মধু, ফলের রস
দ্বি-শর্করা	দুই অনুবিশিষ্ট শর্করা	সক্রোজ , ল্যাটোজ	চিনি ও দুধ
বহু শর্করা	বহু অনুবিশিষ্ট শর্করা	শ্বেতসার গ্লাইকোজন	ডাল, আটা, সবুজপাতা, আলু, শাক-সবজি

☒ প্রোটিন বা আমিষ কি? ও এর উৎস লিখুন।

আমিষ জাতীয় খাদ্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও মাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। একমাত্র আমিষ উপাদানেই নাইট্রোজেন বর্তমান আমিষে শকরা ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। সালফার ফসফরাস এবং আয়রন আমিষে সামান্য পরিমানে থাকে। উৎস অনুযায়ী আমিষ দুই প্রকার।

(১) প্রাণিজ আমিষ-মাছ, মাংস ডিম, পানির, ছানা, কলিজা বা প্রকৃত ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। এসব খাদ্যে দেহের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায় বলে এগুলো উচ্চমানের আমিষ। এসব খাদ্যের জৈব মূল্য বেশী। আমাদের খাদ্য তালিকায় কমপক্ষে ২০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকা দরকার।

(২) উদ্ভিজ্জ আমিষ-ডাল, চিনাবাদাম, চাল, আটা, শিমের বীচি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষ। এগুলো প্রাণিজ আমিষের তুলনায় কম পুষ্টিকর, কারন উদ্ভিজ্জ আমিষের প্রয়োজনীয় সব কয়টা অ্যামাইনোএসিড থাকে না। উদ্ভিজ্জ জৈবমূল্য কম বিধায় তা নিম্নমানের আমিষ।

☒ ফ্যাটস বা স্নেহজাতীয় খাদ্য কি? ও এর উৎসগুলো লিখুন।

একে শক্তি উৎপাদনকারী উপাদান বলা হয়। স্নেহ পদার্থে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাান বেশি থাকে। কার্বনের দহন ক্ষমতা বেশি থাকায় স্নেহহ পদার্থের অনু থেকে বেশি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়।
উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ দুই ধরনেরঃ-

১. উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ-সয়াবিন, সরিষা, তিল, বাদাম, সূর্যমূখী এবং ভুট্টার তেল ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
২. প্রানিজ স্নেহ পদার্থ-চর্বি, ঘি, ডালডা ইত্যাদি প্রাণিজ স্নেহ পদার্থ। ডিমের কুসুমে স্নেহ পদার্থ আছে, কিন্তু সাদা অংশে স্নেহ পদার্থ থাকে না।

একজন সুস্থ সবল পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দিনে ৫০-৬০ গ্রাম চর্বির প্রয়োজন হয়।

☒ ভিটামিন কি ও এর শ্রেণীবিভাগ লিখুন।

ভিটামিন বলতে আমরা খাদ্যের ঐ সব জৈব রাসায়নিক পদার্থকে বুঝি যা খাদ্যে সামান্য পরিমানে উপস্থিত থাকে। ভিটামিনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেহ গঠনে অংশ গ্রহন না করলেও এদের অভাবে দেহের ক্ষয়পূর, বৃদ্ধি সাধন বা তাপ শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়া গুলো সুসম্পন্ন হতে পারে না।
ভিটামিনকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন-ভিটামিন 'এ' 'ডি' 'ই' এবং 'কে'।
২. পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন-ভিটামিন 'বি' ও 'সি'

Scanned by CamScanner

উৎস ঃ

ভিটামিন- 'এ' : দুধ, মাখন, চর্বি, ডিম গাজর, আম, কাঠাল, রঙিন শাকসবজি, মলা মাছ ইত্যাদিতে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়।

ভিটামিন- 'বি' : ঈস্ট, ঢেঁকিছাটাচাল, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগডাল, মটর, ফুলকপি, চিনাবাদাম, শিমের বীচি, কলিজা, হৃৎপিন্ড, দুধ, ডিম, সবুজ-শাক-সবজি ইত্যাদিতে ভিটামিন 'বি' পাওয়া যায়।

ভিটামিন- 'সি' : পেয়ারা, বাতাবী লেবু, কামরাঙ্গা, কমলা, আমড়া, টমেটো, আনারস, কাচামরিচ, তাজা শাকসবজি ইত্যাদিতে ভিটামিনন 'সি' পাওয়া যায়।

ভিটামিন- 'ডি' : দুধ, ডিম, কলিজা, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছের তেল ভোজ্যলে ইত্যাদিতে ভিটামিন 'ডি' থাকে।

উপরে উল্লিখিত সব খাবার থেকে ভিটামিন 'ই' ও 'কে' পাওয়া যায়।

☒ সুষম খাদ্য কি? এর বৈশিষ্ট্য গুলো লিখুন।

সুষম খাদ্য বলতে সেই খাদ্যকে বুঝায় যাতে প্রতিটি খাদ্য উপাদান পরিমান মতো থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে।

সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে দেওয়া হলঃ

১. একজন মানুষের বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের সামর্থ্য থাকতে হবে।
২. খাদ্যে আমিষ, চর্বি ও শর্করার অনুপাত হবে ৪ ঃ ১ ঃ ১।
৩. খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও রাফেজ বা সেলুফোজ সরবরাহের জন্য সুষম খাদ্য তালিকায় ফল ও টাটকা শাকসবজি থাকতে হবে।
৪. খাদ্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমান পানি ও খনিজ লবন থাকতে হবে।
৫. সুষম খাদ্য? অবশ্যই সহজ পাচ্য হতে হবে।

☒ একটি সুষম খাদ্যের তালিকা লিখুন।

কতকগুলো নিয়ম মেনে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে। যথা-

১. ব্যক্তি বিশেষের লিঙ্গ, বয়স, পেশা ও শারীরিক অবস্থা।
২. খাদ্যের মূল্যমান সম্পর্কে জ্ঞান।
৩. দেহের ক্ষয়পূরন ও গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ সরবরাহ নিশ্চিকরন।
৪. খাদ্যে পরিমান মতো ভিটামিন, খনিজ লবন ও পানির উপস্থিতি।।
৫. ঋতু, আবহাওয়া ও খাদ্যাভাস সম্বন্ধে জ্ঞান।
৬. পারিবারিক আর্থিক সঙ্গতি ও সদস্য সংখ্যা।

☒ BMR ও BMI কি?

বেসাল মেটাবলিক রেট (BMR) পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় মানব শরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাপ নির্দেশ করে।

বডি মাস ইনডেক্স (BMI) মানব দেহের গড়না ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে। অর্থাৎ সুস্থ্য জীবন যাপনে মানব শরীরের সুস্বাস্থ্য রক্ষার কোনো নির্দিষ্ট বয়সে শরীরের দৈর্ঘ্যের সাথে চর্বির পরিমানগত সম্পর্ক নির্দেশ করে।

বি এম আই মান নির্ণয় ঃ

BMI = দেহের ওজন (কেজি)/দেহের উচ্চতা (মিটার)^2 উদাহারণ হিসেবে ১২.৫ সেমি. (১.২৫ মিটার) উচ্চতা এবং ৫০ কেজি ওজনের ব্যক্তির বি এম আই হচ্ছে ৩২।

বিএমআই মানদন্ড ঃ

মান নির্দেশিক :

১৮.৫ এর নিচে শরীরের ওজন কম, পরিমিত খাদ্য গ্রহনে ওজন বাড়াতে হবে।

(১৮.৫-২৪.৯) সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মান।

(২৫-২৯.৯) শরীরের অতিরিক্ত ওজন, ব্যায়াম করে অতিরিক্ত ওজন কমানো প্রয়োজন।

(৩০-৩৪.৯) মোটা হওয়ার প্রথমস্তর, বেছে খাদ্যগ্রহন ও ব্যায়ম করা প্রয়োজন।

(৩৫-৩৯.৯) মোটা হওয়ায় দ্বিতীয় স্তর, পরিমিত খাদ্য গ্রহন ও এক্সারসাইজ করা প্রয়োজন।

৪০ এর উপরে অতিরিক্ত মোটা, মৃত্যুঝুঁকি সমূহ সম্ভাবনা, ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন।

বি এম আই মানদন্ডে ব্যক্তিটির সুস্বাস্থ্যের জন্য ৩৮ কেটি ওজন হওয়া প্রয়োজন।

Scanned by CamScanner

☒ **খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষনের বিভিন্ন পদ্ধতি লিখুন।**

খাদ্য সংরক্ষন এমন এক প্রক্রিয়া যাতে খাদ্যের সাধন রোধ করা। ফলে খাদ্যের গুণাগুন, গ্রহন যোগ্যতা ও খাদ্যমান অটুট থাকে। খাদ্য সংরক্ষনে সাধারনত পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক সংক্রমণ এবং খাদ্যের চর্বিজাতীয় অংশের ধারন রোধ করা হয়। মাছের শুঁটকি করন, লোনা ইলিশ, আঁচার, বরফ সংরক্ষণ চিংড়ির নাপতে, মাছের শীদল ইত্যাদি সবাই খাদ্য সংরক্ষনের বিভিন্ন প্রচলিত উপায়।

অধুনা খাদদ্রব্যের ক্যানিং বা কৌটাজাত, ধোঁয়ার মাধ্যমে স্মোকিং প্রভৃতি প্রক্রিয়া খাদ্য সংরক্ষনে ব্যবহার করা হয়।

☒ **খাদদ্রব্য সংরক্ষনে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার লিখুন।**

খাদ্য সংরক্ষনে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্মত অনুমোদিত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় যাতে খাদ্য দ্রব্য পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমন করতে না পারে সাধারনত সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবন, ক্যালসিয়াম এপারনেট, সালফারডাই অক্সাইড, সোডিয়াম বাই সালফেট এন্টি অক্সিজেন্ট যেমন BHA ও BHT খাদদ্রব্য সংরক্ষনে অনুমোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়। তবে স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকার ক্ষতিকারক ফরমালিন, বিভিন্ন কমের রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য সংরক্ষনে ব্যবহার করা উচিত নয়।

☒ **পুষ্টি ও পুষ্টিমান কি?**

পুষ্টি-পুষ্টি উপাদান হচ্ছে প্রতিদিনের খাবারের গুণসম্পন্ন যেসব উপাদান যা দেহের শক্তি ও যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মেধা ও বৃদ্ধি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে, অসুখ-বিসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে এবং মানুষকে কর্মক্ষম করে।

পুষ্টিমান-কোন খাদ্যে কী পরিমান ও কত রকম খাদ্য উপাদান থাকে তার উপর নির্ভর করে ঐ খাদ্যের পুষ্টিমান বা পুষ্টিমূল্য।

যেমন-সিদ্ধচালে ৭৯%, শ্বেতসার, ৬% স্নেহ পদার্থ থাকে এছাড়া সামান্য পরিমাণ আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবন থাকে। ১০০ গ্রাম চাল থেকে ৩৪৫-৩৪৯ কিলো ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। সিদ্ধ চালে শ্বেতসার, আমিষ ও ভিটামিন থাকে। কিন্তু-শ্বেতসারের পরিমান বেশি থাকে। অতএব, চাল একটি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ।

☒ **খাদ্য পিরামিড কি? একটি আর্দশ্য খাদ্য পিরামিড লিখুন।**

যেকোন একটি সুষম খাদ্য তালিকায় শর্করা, শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ ও স্নেহহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য অন্তর্ভূক্ত। একজন কিশোর বা কিশোরী, প্রাপ্ত বয়স্ক একজন পুরুষ বা মহিলার সুষম খাদ্য তালিকা লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, শর্করাকে নিচু স্তরে রেখে পর্যায়ক্রমে পরিমানগত দিক বিবেচনা করে শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ, স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয় তাকে আর্দশ খাদ্য পিরামিড বলে।

চিত্র : আদর্শ খাদ্য পিরামিড

চিত্রে এই পিরামিডের শীর্ষে রয়েছে স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য আর সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে শর্করা।

Student Work

ভিটামিন-এর অভাবজনিত রোগ

রাতকানা

এ রোগের লক্ষণ স্বল্প আলোতে বিশেষ করে রাতের আবছায়ায় দেখতে না পাওয়া। আমাদের চোখের রেটিনায় (Retina) 'রড' এবং 'কোণ' নামে দুই প্রকার আলোক সংবেদী কোষ আছে। 'রড' কোষের সাহায্যে আমরা কম আলোতে রাতের বেলা এবং 'কোণ' কোষের সাহায্যে বেশি আলোতে দেখতে পাই। 'রড' কোষে রডপসিন নামে একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকে। দেহে রেটিনল জারিত হয়ে রেটিনালে রূপান্তরিত হয়, রেটিনাল অপসিন নামক প্রোটিনের সঙ্গে মিলিত য়ে রডপসিন তৈরি করে। রডপসিন অস্থায়ী পদার্থ। চোখে আলো পড়ে যখন রডপসিন ভেঙ্গে রেটিনাল ও অপসিন হয় তখন আমরা দেখতে পাই। আমাদের চোখে অনবরত রডপসিন তৈরি হচ্ছে এবং ভাঙছে। এই ভাঙ্গা গড়ার হার যখন সমান থাকে তখন আমরা ভাল দেখতে পাই। দেহে ভিটামিন এ'র অভাব হলে রডপসিন পুনঃগঠনে ব্যাঘাত ঘটে ও স্বল্প আলোতে দেখতে পাওয়া যায় না। এই অবস্থাকে রাতকানা বলা হয়।

রিকেটস

ভিটামিন ডি'র অভাবে শিশুদের দেহের এমন অবস্থা হয় যাকে আমরা রিকেটস বলে থাকি। ভিটামিন ডি'র অভাবের জন্য অস্থির গঠন সম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে দেহের বৃদ্ধি মন্থর হয়। রিকেটস হলে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিপাক ঠিকমতো হয় না। এই কারণে অস্থিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থিতিয়ে জমতে পারে না। এতে অস্থি দুর্বল হয়ে কাঠিন্য কমে যাওয়াতে দেহের ভারে পায়ের লম্বা হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায়। অস্থির প্রান্তদেশের তরুণাস্থি নরম হয়ে বাড়তে থাকে এতে গাঁট ফুলে যায়। পাঁজরের হাড়ে গিট পড়ে বক্ষদেশ সরু হয়। বিকৃত পাঁজরের জন্য ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কন্যাশিশুর অস্থি কোটরে, অস্থিবিকৃতি ঘটে। এতে তাদের ভবিষ্যতে গর্ভধারণে এবং সন্তান প্রসবে অসুবিধা হতে পারে। মায়ের দুধ ছাড়াবার পর ১-৩ বৎসরের শিশুদের গুরুতর দৈহিক বর্ধনের সময় রিকেট আক্রান্ত হতে বেশি দেখা যায়। এ কারনেই ছোট শিশুদের সকালবেলার রোদে কিছু সময়ের জন্য রাখা হয়; যাতে মানবত্বকের সাথে সূর্যের আলোর সংশ্লেষে শরীরের ভেতর ভিটামিন 'ডি' তেরি হতে পারে।

বেরিবেরি

স্নায়ুর দুর্বলতা থেকে বেরিবেরি হয়। বেরিবেরি শব্দের অর্থ চলাফেরায় অপরাগতা। স্নায়ুর দুর্বলতায় পা অবশ বোধ হওয়ার ফলে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দাঁড়াতে ও হাঁটুতে অসুবিধা হয়। দেহে এক প্রকার ভিটামিন 'বি' (থায়ামিন) এর চরম অভাব স্নায়ুপ্রদাহ থেকে পেশীর জোর কমে যায়, হাত ও পায়ের আঙ্গুল ঝিনঝিন করে, যন্ত্রণা বোধ হয়। প্রথমে পায়ের পাতায় পানি আসে। ধীরে ধীরে হাত, পা, পেট ফুলে যায়। হৃদপিণ্ডে পানি আসে, এতে হৃদপিণ্ড বড় হয়ে যায়, তখন শ্বাসকষ্ট হতে পারে। বেরিবেরি মারাত্মক হলে এসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। একে Wet Beri beri বলে। অন্য এক ধরনের শুকনা বেরিবেরিতে পায়ে পানি আসে না, কিন্তু স্নায়ুর প্রদাহে গোঁড়ালি ফুলে পায়ে ব্যথা আসে। পায়ের পেশীর জোর কমে যাওয়াতে পা অবশ হয়ে রোগী শয্যাশায়ী হয়। বেরিবেরি রোগে দেহকোষের মারাত্মক ক্ষতি থেকে মানবদেহের স্বাভাবিক পুষ্টিরক্ষায় থায়ামিনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রসূতি মায়ের আহারে থায়ামিনের ঘাটতি থেকে শিশুর দেহে জন্মের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই থায়ামিনের অভাব ঘটে। এতে শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। দেহে পানি আসে, শরীর ফোলা দেখায়, হৃদপিণ্ড বেড়ে যায়। হৃদপিণ্ডের কাজের অসুবিধা ঘটে শিশু মারাও যেতে পারে।

স্কার্ভি

ভিটামিন সি'র তীব্র অভাবে দেহের বিভিন্ন তন্তু ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে স্কার্ভি রোগ হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহে ভিটামিন সি'র অভাবে প্রকট হলে ক্লান্তি এবং বিভিন্ন অঙ্গে নিম্নবর্ণিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১) **রক্তবাহী নালীঃ** দেহে ভিটামিন সি'র অভাবে রক্তবাহী নালীর প্রাচীর গাত্রের সংযোজক তন্তুর বিকৃত গঠনের দরুণ নালীপথের দেওয়াল ভঙ্গুর ও ছিদ্রময় হয়। রক্তবাহী নালী এভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে কৈশিক নালীর ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়, ত্বকের বাইরে ও ভিতরে রক্তক্ষরণ হয়, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে।

২) **হাড়ঃ** দেহে ভিটামিন সি'র অভাবে অস্থির গঠন শক্ত ও মজবুত হতে পারে না। এতে অস্থি দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়।

৩) **ত্বক ঃ** ভিটামিন সি'র অভাব ত্বক খসখসে হয়, চুলকায়। ত্বকে ঘা হয়, ক্ষত শুকাতে দেরি হয়। লোমকূপের গোড়ায় রক্তক্ষরণ দেখা যায়। সামান্য আঘাতেই ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ হয়ে কালসিটে দাগ পড়ে।

৪) **দাঁত ও মাড়ি ঃ** দাঁতের মাড়ি ফুলে নরম হয়ে যায়। দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত পড়ে। দাঁত নড়বড় করে। দাঁতের এনামেল উঠে যায়। দাঁত দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে অকালে দাঁত পড়েও যেতে পারে।

৫) **এনিমিয়া ঃ** লোহার বিশোষণ, সঞ্চয় ও হিমোগ্লোবিন তৈরির কাজে ভিটামিন সি'র ভূমিকা থাকায় এর অভাবে এসমস্ত কাজে বিঘ্ন ঘটে। লোহার বিশোষণে, ব্যাঘাত ঘটায় এবং দাঁতের মাড়িতে ও ত্বকের ভিতরে ও বাইরে রক্তক্ষরণের কারণে এনিমিয়া হতে পারে। দেহে ভিটামিন সি'র অভাব ফলিক এসিডের বিপাক বিঘ্নিত হওয়ার এনিমিয়া হতে পারে।

Scanned by CamScanner

এনিমিয়া

দেহে লোহার অভাবে যে রোগ হয় তার নাম এনিমিয়া। এনিমিয়া রোগে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন বহন করে দেহকোষে পৌঁছিয়ে দিতে সমর্থ হয় না। এনিমিয়ার লক্ষণ শারীরিক দুর্বলতা, ক্লান্তি, অবসাদ, ফ্যাকাশে রং, মলিনতা, খাওয়ার অরুচি এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যাওয়া। রোগ কঠিন আকার ধারণ করলে হৃদপিণ্ডের দ্রুত সঞ্চালন (বুক ধড়ফড়) ও হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এনিমিয়া লক্ষণ নিশ্চিতভাবে দেখা দিলে শুধু খাদ্যের উপর নির্ভর না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। দৈনিক আহারে পর্যাপ্ত পরিমাণ লোহা অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন এবং ১৫-২০ মিলিগ্রাম অতিরিক্ত লোহা রাখাও কঠিন কাজ। অথচ এই পরিমাণ লোহা রোগীর রোগ নিরাময়ের জন্য নিতান্তই অপ্রতুল।

মেরাসমাস

খাদ্যে প্রোটিন বা আমিষের অভাবজনিত অপুষ্টি রোগের একটি হলো মেরাসমাস। পরিপূরক খাদ্য ৬ মাস বয়সের পরে দেরিতে খেতে দিলে এবং সে সময় মায়ের বুকের দুধ কমে গেলে শিশুদের মেরাসমাস হয়। শিশুর বৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধ পর্যাপ্ত না হলে আবার সে সময় পরিপূরক খাদ্যও না দেওয়া হলে সেক্ষেত্রে প্রোটিনেও ক্যালরির অভাবে অপুষ্টি হয়। এই সময় ঘন ঘন ডায়রিয়া হয়ে অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়। মেরাসমাসে আক্রান্ত শিশুর ত্বক-নিম্নস্থ চর্বি এবং পেশী ক্ষয় পেয়ে হাড্ডি চর্মসার হয়ে যায়। দেহের তুলনায় মাথা বড় দেখায়। মাথার চুল খুব হালকা হয়, চুল কাটলে আর বাড়তে চায় না। শিশুর ওজন কাম্য ওজনের ৬০ শতাংশের নিচে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে অপুষ্টি চলতে থাকলে শিশু লম্বায়ও বাড়ে না। চামড়ার উপরে ফেটে ক্ষত হয়। ত্বকের নিচে বুকের হাড় সম্পূর্ণভাবে গণা যায়। এই অবস্থায় খুব সহজে রোগ জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। মেরাসমাসে আক্রান্ত শিশু উদাসীন হয় বেং ঘ্যান ঘ্যান করে। চরম অপুষ্টিতে শিশু চলনশক্তি হারিয়ে ফেলে, ঘন্টার পর ঘন্টা একইভাবে শুয়ে বা বসে থাকে, কখনও চোখে বুঝে থাকে। পরিশেষে মুখমন্ডলের ত্বক-নিম্নস্থ চর্বি কর্মে গেলে চামড়া কুচকে বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় দেখায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেরাসমাস রোগীদের এনিমিয়া হয় এবং অন্যান্য অভাবজনিত রোগেরও লক্ষণ প্রকাশ পায়। মেরাসমাসের প্রাথমিক অবস্থায় শিশুদের খাওয়ার রুচি থাকে। পর্যাপ্ত খাদ্য দিয়ে রোগ নিরাময় করা যায়। কিন্তু রোগের শেষ অবস্থায় খাওয়ার অরুচি হয়। রোগী খেতে চায় না এবং খাওয়াতে গেলে মুখ থেকে ফেলে দেয়। খুব যত্নের সাথে দুধ পান করিয়ে এবং ধীরে ধীরে খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে রোগ ভাল করা যায়।

কোয়াশিয়রকর

খাদ্যে প্রোটিন বা আমিষের অভাবজনিত অপুষ্টি রোগের একটি হলো কোয়াশিয়রকর। ১৯৩০ সনের প্রথম দিকে ডঃ সিসেলি উইলিয়াম (Dr. Cicely Williams) কোয়াশিয়রকর নামটির প্রস্তাব করেন। গর্ভবতী মা কোলের শিশুকে বুকের দুধ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ফলে যে রোগ হয় তাকে আফ্রিকা মহাদেশের লোকেরা কোয়াশিয়রকর বলে। এক বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে সাধারণত কোয়াশিয়রকর দেখা যায় না। মেরাসমাস যে বয়সে হয় কোয়াশিয়রকর তার চেয়ে সামান্য বড় শিশুদের হয়। কোয়াশিয়রকর রোগে আক্রান্ত শিশুর শরীরে পানি আসে। তথাপি ওজন কাম্য ওজনের ৬০% নিচে থাকে। মেরাসমাসের চেয়ে কোয়াশিয়রকর রোগীরা লম্বায় কম বাড়ে। উদাসীনতা এবং অনীহা, ফোলা মুখমন্ডল, মাথায় অনুজ্জ্বল হালকা চুল এবং দেহে জলাধিক্য, চামড়ায় পরিবর্তন কোয়াশিয়রকরের লক্ষণ। চামড়ার উপরে ছোপ ছোপ দেখা যায়, চামড়া উঠতে দেখা যায়, চামড়ায় ক্ষতেরও সৃষ্টি হয়। রোগ কঠিন হলেও ত্বকের নিচে কিছু মাংসপেশী উপস্থিত থাকে। মেরাসমাস এবং কোয়াশিয়রকর উভয় রোগই দেহে ক্যালরির অভাবে ঘটে।

Scanned by CamScanner